ভক্তি-সন্দর্ভসার

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।"

অদ্বিতীয় বৈষ্ণবদার্শনিক সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্য মহাভাগবত
শ্রীল শ্রীযুক্ত জীবগোস্বামিপাদের

ভক্তি-সন্দর্ভ গ্রন্থ

ও

সুবিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা অশেষগুণালঙ্কৃত
পরমভাগবত পূজনীয়—
প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি-
ভাগবতসিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের
উপদেশাবলম্বনে
ভক্তকৃপাভিখারী শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
"বসুমতী" বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

গ্রন্থকারকর্তৃক নিত্যসেবিত

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ

উৎসর্গ পত্র

আমার পরমারাধ্যতম প্রত্যক্ষ

দেবরূপী পিতৃদেব

পরলোকগত

শ্রীদুর্গাবর রায় চৌধুরী

মহোদয়ের

উদ্দেশ্যে

আন্তরিক ভক্তির সহিত

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ

করা হইল

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ বিজয়েতাম্।

পিতৃদেবের প্রতি নিবেদন।

বাবা, আজ প্রায় বত্রিশ বৎসর গত হইতে চলিল, আপনি আমাদিগকে এই মরজগতে রাখিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সদাই মনে পড়ে আপনার সেই তপ্তকাঞ্চন-কলেবর, আপনার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি,—আপনার আজীবন হবিষ্যান্ন ভোজন ও নিরন্তর ভগবদ্-ভজন; মনে পড়ে আপনার আদর্শ-চরিত্র, সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে, দারুণ শোকে ও তাপে আপনার চিত্তের স্থৈর্য্য; মনে পড়ে—অন্যের নিরতিশয় অন্যায় ব্যবহারে ও কঠোরবাক্য প্রয়োগেও আপনার চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধেরও অনুদ্রেক; আরও মনে পড়ে আপনার সর্ব্বজীবে দয়া এবং এই অধম অকৃতী সন্তানের প্রতি অপার স্নেহদৃষ্টি। তখন বুঝি নাই, পিতঃ, পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহের তুলনা জগতে নাই;—তখন বুঝি নাই, এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা জীবনে আর কাহারও নিকট পাইব না। পরে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগোপিকাগণের প্রতি শ্রীভগবানের নিম্নলিখিত উক্তিতে এই কথার ঝঙ্কার পাইয়াছি।

"ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ।"

অর্থাৎ হে সুমধ্যমাগণ, পিতামাতা যেমন অভজনকারী

আতুর, অন্ধ ও বধির পুত্রদিগকে ভজন করিয়া থাকেন; ইহাই নিরপবাদ ধর্ম্ম ও নিরুপাধিক সৌহার্দ্দ্যের উদাহরণ।

শাস্ত্রও বলেন, প্রথমতঃ পিতামাতাকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। কিন্তু পিতঃ, আমি আপনার সেবা করিতে পারিলাম না, যত দিন জীবিত থাকিব, আমার এই প্রাণের বেদনা দূরীভূত হইবে না।

পিতঃ, যে ভক্তি-সুধাধারায় আপনার আদর্শ পবিত্র জীবন পরিষিক্ত হইয়াছিল, যে ভাবে বিভাবিত দেখিয়া জনসমাজ, মহৎ ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি ব্যক্তিমাত্রেই আপনাকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিত, আপনার সেই ভক্তি-সিন্ধুর বিন্দু-মাত্রও আমাতে সঞ্চারিত হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতাম; কিন্তু তথাপি আপনার শ্রীচরণধূলির কণিকা-স্পর্শে এবং আপনার অকৃত্রিম স্নেহধারায় এই ক্ষুদ্র জীবনে যে সৎসঙ্গ ও মহৎ কৃপা লাভ হইয়াছে ও হইতেছে, ভক্তি-সন্দর্ভাত্মক এই ক্ষুদ্র শ্রীগ্রন্থখানি তাহারই অমৃতময় ফল। আপনার স্নেহ ও কৃপার প্রতিদান অসম্ভব। আজ আপনার আশীর্ব্বাদলব্ধ ভক্ত্যাভাসের যৎকিঞ্চিৎ অভিব্যক্তিস্বরূপ এই গ্রন্থখানি আপনার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিলাম। আপনি স্বস্থান হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

আপনার অতিশয় স্নেহের অকৃতী অধম পুত্র—

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।

ভূমিকা

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিমহোদয়কৃত ষট্সন্দর্ভ অতি উপাদেয় গ্রন্থ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত দার্শনিকতত্ত্বাবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত, কিন্তু দার্শনিক গ্রন্থ বলিলে জনসাধারণ যেরূপ মনে করেন, এই গ্রন্থ ঠিক সেরূপ নহে। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে ষড়্‌দর্শনের সূত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের বৃত্তিভাষ্য ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে ভারতীয় ষড়্‌দর্শন বিবৃত, বিস্তৃত, বিকশিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে পণ্ডিতগণের জ্ঞান-চর্চ্চার অফুরন্ত উৎস সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চ্চায় মানব-আত্মা চরিতার্থ হয় না, পরিতৃপ্তি লাভ করিতেও পারে না। আত্মারাম এবং আপ্তকাম হইলেও মানুষের আত্মায় অজ্ঞাতভাবে একটা শূন্য শূন্য ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। স্বয়ং শ্রীবাদরায়ণও এই অভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত সততই অপ্রসন্ন থাকিত। দেবর্ষি নারদের কৃপায়, তাঁহার উপদেশে শ্রীমৎ বাদরায়ণ ভগবদ্ভক্তির স্নিগ্ধমধুর মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া নবজীবন লাভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষণ্ণ চিত্ত প্রসন্ন হইল। সাধারণ দার্শনিক জ্ঞানের উপরেও তিনি আরও সূক্ষ্ম অথচ সুমধুর দর্শনের সন্ধান

প্রাঙ্গা তাহাতেই বিভোর হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। মহাভারতে তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি মাত্র ধ্বনিত করিয়া রাখিয়াছিলেন—যথা শ্রীগীতায় :—

১। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

২। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

শ্রীভগবান্ শ্রীমদর্জ্জুন মহোদয়কে এইরূপ উপদেশ করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে আরও নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন,—"অর্জ্জুন, তুমি আমার প্রিয়সখা; আমি তোমায় বড় ভালবাসি—এবার তোমায় সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ দিতেছি; তাহা এই যে,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।"

শ্রীভগবান্ তদীয় প্রিয়সখা শ্রীমদর্জ্জুন মহোদয়কে এই চরম উপদেশ প্রদান করিলেন যে, তুমি আমার ভক্ত হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তাহা হইলেই তুমি আমাকে নিশ্চয় পাইবে।"

এখন দেখুন, প্রকৃত দর্শনের উদ্দেশ্য ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান-দর্শন বা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানলাভ। জ্ঞানে তাঁহাকে জানা

যায়, কিন্তু ভক্তি দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে পাওয়া যায়। কেবল যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা নহে, তাঁহাকে বশীভূত করা যায়। শ্রুতি বলেন,—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"বশীকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যাঃ সৎপতিং সৎস্ত্রিয়ো যথা।"

সুতরাং সাধারণ দর্শন অপেক্ষা ভক্তি-দর্শনের শক্তি যে শতসহস্রগুণে অধিকতর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীপাদ শ্রীজীবের ষট্সন্দর্ভ এই জাতীয় দর্শন—অর্থাৎ ইহা অতিসূক্ষ্ম অথচ অতিমধুর ভক্তি-দর্শন। জ্ঞান দ্বারা সামান্যাকার ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হয়, কিন্তু ভক্তি দ্বারা সম্যক্-রূপে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান জন্মে—এতদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন-শাস্ত্রের সকল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হওয়ার আরও উপরে শ্রীভগবানের আনন্দ-মধুর রসময় রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। ইহাই সর্ব্বসাধনার স্বাভাবিক চরম উদ্দেশ্য। এই ষট্সন্দর্ভ সাধকগণের নিকটে সেই সন্ধানই প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং এই শ্রীগ্রন্থখানির অধ্যয়ন জীবের অশেষ কল্যাণসাধক। ইহার প্রথম সন্দর্ভচতুষ্টয়ে উপাস্য-তত্ত্ব-বিচার করা হইয়াছে। অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনলীলা-রসময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণই যে উপাস্যতত্ত্বের পরতম, তাহা বহুল শাস্ত্র-গবেষণায় সুপ্রমাণিত করা হইয়াছে।

পঞ্চম সন্দর্ভের নাম ভক্তি-সন্দর্ভ। ইহাতে অভিধেয় তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ষষ্ঠসন্দর্ভ,—প্রীতিসন্দর্ভ। ইহাতে

প্রয়োজনতত্ত্বের পর্য্যালোচনা আছে। বলা বাহুল্য, আমাদের ন্যায় জীবের পক্ষে ভক্তিসন্দর্ভের অনুশীলন অতি প্রয়োজনীয়। এই ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত এবং ভক্তি-সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিচারে পরিপূর্ণ। যাঁহারা সংসারাশ্রম হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা পাইয়াছেন, এই শ্রীগ্রন্থে মনোনিবেশ তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভবনীয়। এ জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সে সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। যাঁহারা বিষয়কার্য্যের মধ্যে অবস্থান করিয়াও—নিরন্তর কর্ম্মচক্রের ভীষণ ঘর্ঘরে কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়াও এই শ্রীগ্রন্থপাঠে প্রতিদিন কিছু কিছু সময় অতিবাহিত করিতে পারেন, তাঁহারা পরম ভাগ্যবান্।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর স্থাপত্যবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ আমাদের পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কেও আমরা এই ভাববিচারে প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ বলিয়াই মনে করি। তিনি এই মহা দায়িত্বপূর্ণ অতি কঠোর কার্য্য সুব্যবস্থিত ও সুসম্পন্ন করিয়াও অতি উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া নিজের জীবন সার্থক করিতেছেন—এবং মানবজীবনের প্রকৃত স্তরে প্রবেশ-লাভ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় জীবের পক্ষে আর কি হইতে পারে? কেবল অধ্যয়নেই তাঁহার অধ্যয়ন-ব্যাপার পর্য্যবসিত হয়

না; তিনি যাহা অধ্যয়ন করেন, নিজের জীবনেও তাহা পর্য্যবসিত করেন। ইনি ভক্তিগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া নিজের জীবনটিকেও সেইভাবে গঠিত করিয়াছেন—ভক্তির অনুষ্ঠানগুলি নিজের জীবনেও সমাচরিত করিয়াছেন। অনেকে অধ্যয়ন করেন, অধ্যাপনা করেন, কিন্তু নিজের জীবনে কোন অনুষ্ঠান করেন না। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় কেবল যে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মক্ষেত্রে যশোবান্ নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মবীর, তাহা নহেন—তিনি ভক্তিরাজ্যেও এক জন আনুষ্ঠানিক ভক্ত—প্রকৃতই ভক্তবীর।

এতাদৃশ ভক্তগণ যখন কোন সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন বা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার অধ্যয়ন ও শ্রবণ কেবল যে স্বার্থেই নিয়োজিত হয়, তাহা নহে; পরার্থেও নিয়োজিত হইয়া থাকে। ইনি যখন অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীসন্দর্ভ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিতেছিলেন, তখনই আমাদের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, এই অধ্যয়নফল কেবল অধীতীর আপন স্বার্থে পর্য্যবসিত হইবে না; সহস্র সহস্র ভক্তিপথের পথিক, ভক্তি-সাধনার সাধক তাঁহার এই অধ্যয়নজনিত এই সুধা-মধুর ভক্তিফলের সুধাস্বাদে চরিতার্থ হইবেন; এ অমৃতপানে অমর হইবেন।

শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের কৃপায় আমাদের ধারণা ঠিকই হইয়াছে; কর্ম্মবীর ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া

এবং স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্রীভগবৎ-কৃপায় ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অবিসংবাদিত বিপুল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, নিজের জীবনে ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানে ভক্তিবিষয়ে বর্ণনা করার যে সমুচ্চ অধিকার পাইয়াছেন—এবংবিধ গ্রন্থ-রচনার যে শক্তি ও প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, সেই সকল শক্তিসামর্থ্য-গৌরবে, ভক্তির সেই অনির্ব্বচনীয় প্রভাব-বৈভব-সম্পদে সুসম্পন্ন হইয়া ভক্তি-সন্দর্ভগ্রন্থ হইতে ভক্তি-সন্দর্ভসার নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন, ভক্তিসাধক-গণের পক্ষে তাহা প্রকৃতই মহানির্ম্মাল্য—সাক্ষাৎ শ্রীভগ-বানের পদারবিন্দ-নিস্যন্দিত ভক্তি-মকরন্দ-বিমিশ্র শ্রীচরণ-তুলসী। শ্রীভাগবত বলেন,—

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ।"

১।৭।১০ শ্লোক।

অর্থাৎ "নলিননয়ন শ্রীভগবানের শ্রীচরণার্পিত পদ্ম-কিঞ্জল্ক-মিশ্রিত তুলসীর বায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দসেবিসনকাদির চিত্তে হর্ষ ও তনুতে পুলকের সঞ্চার করিয়াছেন।"

যাঁহারা অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে ভাবের একতা দর্শন করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, এই শ্রীগ্রন্থরূপ নির্ম্মাল্য

দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দেও তুচ্ছ বুদ্ধি জন্মে এবং ভজনানন্দের আধিক্যের উপলব্ধি হয়।

গ্রন্থ-বিরচন অনেকের দ্বারাই হয়, কিন্তু যে রস যিনি নিজে আস্বাদন করেন, তাঁহার স্বাদ তিনি নিজে যেমন বলিতে পারেন, অপরে তেমন পারেন না। স্বয়ং প্রত্যক্ষের ফল, জনশ্রুতিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক প্রবল ; অনুমান অপেক্ষাও প্রবল।

ভক্তি-সন্দর্ভসার গ্রন্থের গ্রন্থকার স্বয়ং যে ভক্তি-রসামৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তাহারই সার সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত ভক্তি-সন্দর্ভ অপার অনন্ত ভক্তি-সমুদ্র। ইহাতে অনন্ত রত্ন নিহিত আছে। ইহা ভক্তির অক্ষয় অসীম ভাণ্ডার। যদি কোন মহাজন এই বিপুল গ্রন্থের সারসঙ্কলনপূর্ব্বক বিষয়ব্যাপারে ব্যাপৃত নরনারীগণের পাঠের উপযুক্ত করিয়া প্রচার ও প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা সংসার-সন্তাপতপ্ত নরনারীগণের যে অশেষ উপকার হয়, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি? শ্রীভক্তি-সন্দর্ভসার-গ্রন্থকার মহোদয় ঠিক সেই উপকারই করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা এক দিকে বঙ্গভাষা যেমন সমৃদ্ধিশালিনী হইবেন, অপর দিকে বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাগণও তেমনই উপকৃত হইবেন। শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে :—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।

তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিকৃক্ষয়াঃ ॥১০॥
তদ্বাগ্বিসর্গোজনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ১।৫ অঃ ॥১১॥

শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণিত না হইলে কাব্যমাত্রই যে সাধুগণের আদরণীয় নয়, তাহা প্রদর্শন করার জন্যই প্রথম পদ্যটির অবতারণা। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারযুক্ত কাব্যেও যদি জগৎপবিত্র হরির মহিমা বর্ণিত না হয়, তবে তাহা বায়স-তীর্থ বলিয়াই সাধুগণের পরিত্যাজ্য। উচ্ছিষ্ট-বিচ্ছিন্ন অন্নাদিযুক্ত স্থান যেমন ঘৃণিত কাকাদিরই রমণীয়, কিন্তু সুপবিত্র মানস-সরোবর-বিহারী হংসগণের পরিত্যাজ্য; সেইরূপ শ্রীভগবৎ-কথা-বিবর্জ্জিত বিবিধগুণযুক্ত কাব্যাদিও কাকতুল্য কামিগণেরই আদরণীয়; কিন্তু জগৎ-পবিত্রহরিযশোবর্ণনাভাবে উহা সত্ত্বপ্রধান ভাগবত পরমহংসগণ উহার আদর করেন না।

আবার অপরপক্ষে কোন কাব্যে তাদৃশ কবিগুণাদি না থাকিলেও যদি শ্রীভগবান্ অনন্তদেবের মহিমা তাহার প্রতি শ্লোকে বর্ণিত হয়, তাহা হইলেও তাদৃশ কাব্য জনসমূহের পাপ বিনষ্ট করে। তাহাই সাধুগণের সমাদৃত।

কেন না, শ্রীভগবানের নামই তাহাদের শ্রবণীয়, জপনীয় এবং কীর্ত্তনযোগ্য।

এই শ্রীগ্রন্থে শ্রীভগবানের নামগুণলীলাদির সার অতি চিত্তাকর্ষিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যখন দেখিব, বাঙ্গালার প্রতি গৃহে এই গ্রন্থ পঞ্জিকার ন্যায় সযত্নে সুরক্ষিত হইতেছে, তখনই আমার আশালতা ফলবতী হইবে। অলমতি-বিস্তরেণ।

২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট
১৩৩৩ সাল

বশংবদ
শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা (বিদ্যাভূষণ)

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম

পূজনীয় প্রভুপাদগণের

মন্তব্য ও আশীর্ব্বাদ

ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল

১৬১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১লা জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৩ সাল।

পরম ক্ষেমার্হবর্য্য,

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী—

মহোদয় অশেষ প্রীতিভাজনেষু।

ভবদ্বিরচিত ভক্তি-সন্দর্ভসার গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম-প্রীতি লাভ করিলাম। অদ্বিতীয় দার্শনিক পূজনীয় শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ভাগবতসন্দর্ভের অনুসরণে প্রাঞ্জল ভাষায় এমন বিশদভাবে রচিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে অজ্ঞ ব্যক্তিও দুর্ব্বোধ সাধ্যসাধনতত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁহার করুণার শীতল ছায়ায় রাখিয়া এই ভাবে বঙ্গভাষার ভাণ্ডার পূরণ করান।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আমাদের দেশের বাতাস যেন একটু ফিরিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা না হইলে যে ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের কথা শুনিলে হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন, বৈষ্ণব দেখিলে বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতেন, তাঁহাদের আর শাস্ত্র আলোচনায় এবং বৈষ্ণব-সেবায় শ্রদ্ধালু দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাই ইংরাজী বিদ্যায় বিচক্ষণ আমাদের পরম শুভাশীর্ব্বাদভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে "ভক্তি-সন্দর্ভ-সারের" উপহার লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিতে পাইতেছি; তাও আবার ইংরাজী ভাষায় নয়, বাঙ্গালা ভাষায়। ইহাতে সেই সুবাতাসেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে না কি? শ্রীমন্ মহাপ্রভু করুন, এই সুবাতাসে জগৎ ভরিয়া যাউক, পাপি-তাপীর তাপিত প্রাণ শীতল হইতে থাকুক।

অধুনা আমাদের দেশের অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবরের মুখে শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের,—আমাদের জাতির যথার্থ গৌরব করিবার যদি কিছু থাকে তো তাহা হইতেছে বাঙ্গালী বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয়গণের বিরচিত

শ্রীশ্রীভক্তিগ্রন্থ সমূহ। এমন সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ অন্য কোন দেশে অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। এই দার্শনিক শ্রীগ্রন্থ সমূহের শিরোমণি হইতেছেন, শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-বিরচিত ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ। শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ তাহারই অন্যতম। ইহাতে শ্রীভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য সকল কথাই শাস্ত্রযুক্তি সহকারে সুমীমাংসিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সংস্কৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ। সাধারণের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীশবাবু তাঁহার এই "ভক্তি-সন্দর্ভসার" গ্রন্থে সরল বাঙ্গালা ভাষায় সেই ভক্তি-সন্দর্ভের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার সে প্রয়াস সফল হইয়াছে। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমি তাহাই বুঝিয়াছি, অমিত আনন্দও লাভ করিয়াছি।

এই "ভক্তি-সন্দর্ভসার" গ্রন্থে আর একটা ভারী দরকারি জিনিষ আছে। সেটি হইতেছে, অনেকগুলি সৎ-সিদ্ধান্ত সহজবোধ্য করিয়া দিবার উপযুক্ত লৌকিক দৃষ্টান্ত এবং উপাখ্যান। এগুলি তিনি তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা আমার পরমপ্রীতি-ভাজন শ্রীমান্ প্রাণগোপাল গোস্বামীর ব্যাখ্যা শ্রবণপ্রসঙ্গে সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্যাখ্যা ও বক্তৃতার কথা প্রায় হাওয়ায়

কথা হাওয়াতেই মিশাইয়া যায়। শ্রীশবাবু গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ করিয়া এগুলিকে সুরক্ষিত করিলেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় এই শ্রেণীর সিদ্ধান্ত গ্রন্থের স্থান নির্দ্দিষ্ট দেখিলে আমরা সুখী হইব। পরিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা, তাঁহার কৃপায় শ্রীশবাবু সুখময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই শ্রেণীর পবিত্র সাহিত্যিক উপহারে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার রত্নমণ্ডিত করিতে এবং দেশবাসীকে প্রকৃতভাবে উপকৃত করিতে থাকুন। ইতি

৪০।১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন,
৩১শে বৈশাখ
১৩৩৩ সাল।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

এই ভক্তি-সন্দর্ভসার গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতের অদ্বিতীয়
শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীযুক্ত
প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের

মন্তব্য

বিশ্ববাসীকে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যধুরন্ধর শ্রীজীবগোস্বামিচরণ "ভক্তি-সন্দর্ভ" প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া এবং উক্ত গ্রন্থের ভাষা, ভাব ও তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া সাধারণের বোধের অনুপযোগীই ছিল। তজ্জন্য অনেকেই অভাব বোধ করিতেন। অধুনা শ্রীমান্ শ্রীশ-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের মূলীভূত পদার্থগুলি লইয়া বঙ্গভাষায় বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন, অনেকে ইহা অবলম্বনে ভক্তিতত্ত্ববোধে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন, এইরূপ আশা আমি খুবই করিতেছি। লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে, বাস্তবিকই শ্রীমানের লেখা হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে। ভক্তিগ্রন্থগুলির এইরূপ সমা-লোচনা বাহির হইলে জগতের যে সাতিশয় হিত সাধিত হইবে, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। লেখকের পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত। অধিকেনালম্। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণব-কৃপাভিখারী
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী
নবদ্বীপ বৈষ্ণবপাড়া, নদীয়া।

সম্পাদকের মন্তব্য

পূজনীয় প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত প্রাণগোপালগোস্বামিমহোদয়গণ এবং পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ গ্রন্থের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির ঐ শ্রীগ্রন্থের সারসঙ্কলন-প্রয়াস দুঃসাহ-সের পরিচায়ক মাত্র, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি ও আমার জনৈক বন্ধু শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আমাদের গুরুদেব পূজনীয় প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি-চরণের ভক্তি-সন্দর্ভ-ব্যাখ্যা হইতে যৎকিঞ্চিৎ সার সংগ্রহ করি। পরে আমি যথাসাধ্য ঐ মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করি। এতদুভয় অবলম্বনে এবং পূজনীয় প্রভুপাদ এবং পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আদেশে, আমার পরমারাধ্য শ্রীরাধা-গোবিন্দ দেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া, এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহসী হই। উক্ত পণ্ডিত মহোদয়গণ এবং পূজনীয় প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দগোস্বামিচরণ কৃপা করিয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুমোদন করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের চরণে আমার আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। ইতি

৫১ নং বদ্রীদাস
টেম্পল্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী

মঙ্গলাচরণম্

"হরের্নাম হরের্নাম
হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-
রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

"পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥
দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ।"

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৶০	১৬	"দেবর্ষির" পূর্ব্বে	"যখন" হইবে।
।৵০	১০	ঘর্ঘরে	ঘর্ঘর
॥৶০	৮	বশবংদ	বশংবদ
৪	২০	শতধাকল্পিতস্ত	শতধা কল্পিতস্ত
৪	২২	স্কন্দপুরাণধৃত শ্রুতিবচনম্	পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ২১
৭	১	নর্ব্বিশেষ	নির্ব্বিশেষ
১০	১০	মমতাবোধকেই	মমতাবোধরূপ ভক্তিকেই
১০	১৩	হৃষিকেশ সেবনং	হৃষীকেশসেবনং
১০	১৬	"অন্যাভিলাষিতাশূন্য"	পরে , হইবে।
১১	৬	বিভন্নাংশ	বিভিন্নাংশ
১১	৯	চিৎশক্তি	চিচ্ছক্তি
১২	১১	অই। সে	আইসে
৬৬	৫	"কপিলদেব-বাক্যম্"	ইহার পূর্ব্বে "তথাহি শ্রী" হইবে।
৮৭	১৪	আলয়ে	আশ্রমে
৯২	২	অনুতত্ত্ব	অণুতত্ত্ব
৯৫	১৮	পরমাপরাধং	নাম্নঃ পরমমপরাধং
৯৫	১৯	কথমুপসহেতেত্য	কথমুসহতে তদ্
৯৬	৩	অনুমান-প্রমাণ	অনুমান ও প্রমাণ
৯৭	১৭	ভজে	ভজিতে প্রবৃত্ত হয়
১১২	১৯	যানাস্থার	যানাস্থায়
১১৪	১৮	"কারণ"	এই শব্দটি হইবে না।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	২১	তৎকৃতম্	তৎকৃতঞ্চা
১৪	১৮	সমায়াত	সমায়ত
১৪	১৮	লহর	লহরী
২১	৭	পরিচ্ছেদে	অধ্যায়ে
২৫	১	দারিদ্র ব্যক্তি	দরিদ্র ব্যক্তি,
২৫	২	জীবস্থানীয়	জীবস্থানীয় ;
২৫	২	বস্তু স্থানীয়	বস্তুস্থানীয় ;
২৫	২	সর্ব্বজ্ঞ	সর্ব্বজ্ঞ,
২৬	১৬	তথা হি	তথাহি
৩৬	১৬	তথা হি	তথাহি
৪১	১০	জ্ঞানই	জ্ঞানই,
৫৬	১৩	ভক্তিযোগ	ভক্তিযোগঃ
৫৭	৮	উপহিত	উপস্থিত
৫৮	৭	প্রাণহীন মৃত ;	প্রাণহীন ; মৃত
ঐ	১০	বিনাশিনী	বিনাশনম্
৬০	৮	সাধূ	সাধু
৬৪	৭	প্রত্যব্যয়ের	প্রত্যবায়ের

শ্রীশ্রীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী—

ভক্তি-সন্দর্ভসার

পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ভাগবত-সন্দর্ভ ছয় ভাগে বিভক্ত। এই জন্য উক্ত গ্রন্থের অপর নাম ষট্‌সন্দর্ভ। সন্দর্ভ শব্দের অর্থ—প্রতিপাদ্যশাস্ত্রের গূঢ়ার্থপ্রকাশক গ্রন্থ, অর্থাৎ যে গ্রন্থ দ্বারা শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যাদি উদঘাটিত হয়, তাহাকে সন্দর্ভ কহে। শ্রীমদ্ভাগবতই এই সন্দর্ভ গ্রন্থের উপজীব্য, এই জন্য ইহার নাম শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ।

নিম্নোক্ত ছয় ভাগে ভাগবত-সন্দর্ভ বিভক্ত, যথা—১। তত্ত্বসন্দর্ভ, ২। ভগবৎসন্দর্ভ, ২। পরমাত্মসন্দর্ভ, ৪। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ৫। ভক্তি-সন্দর্ভ, ৬। প্রীতি-সন্দর্ভ। প্রথমোক্ত সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ে সম্বন্ধতত্ত্ব, পঞ্চম অর্থাৎ ভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়তত্ত্ব এবং ষষ্ঠে প্রয়োজনতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের রীতি অনুসারে এই শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে।

অবতরণিকা বাক্যসমূহ ইহার সূত্রস্থানীয়; শ্রীভাগবতীয় বাক্যই ইহার বিষয়-বাক্য এবং শ্রীধর স্বামীর টীকাই ইহার ভাষ্যস্থানীয়।

পূর্ব্বে দক্ষিণদেশসমুদ্ভব শ্রীলগোপাল ভট্ট গোস্বামিচরণ প্রেমভক্তি-রসভাবিত-তনু শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল

সনাতন গোস্বামিচরণদ্বয়ের সন্তোষবিধানার্থ উক্ত তত্ত্বত্রয় অবলম্বনে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কেবল ভক্ত-প্রীত্যর্থেই শ্রীল গোপাল ভট্ট কতিপয় ভক্তিসিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র, গ্রন্থ-প্রণয়ন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, কাজেই উক্ত রচনা ক্রান্ত, ব্যুৎক্রান্ত ও খণ্ডিত এই ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ছিল। পূজ্যপাদ শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ উক্ত ত্রিবিধ দোষ পরিহার পূর্ব্বক বহুল পর্য্যালোচনা ও পরিবর্দ্ধন করিয়া উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন। এই কার্য্যে শ্রীল জীব-গোস্বামিচরণের পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ পায় নাই। বরং মূলে 'জীবক' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তিনি আপনার বৈষ্ণবসুলভ দীনতাই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যে তাঁহার স্বকপোল-কল্পনা নাই, নিজেই তাহা তত্ত্বসন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রথম সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সম্বন্ধ শব্দের অর্থ বাচ্যবাচকরূপ সম্বন্ধ। পরতত্ত্ব বাচ্য এবং বেদাদিশাস্ত্র বাচক। এতদুভয়ের সম্বন্ধই সম্বন্ধতত্ত্ব। পরতত্ত্ব শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। যিনি স্বতন্ত্র, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যে পরতন্ত্র, সে নিকৃষ্ট। স্বাধীন তিনি, যিনি মহান্; অধীন সে, যে ক্ষুদ্র। শ্রীভগবান্ই পরতত্ত্ব, কারণ, তিনি মহান্ ও স্বতন্ত্র; অতএব শ্রেষ্ঠ। জীব অণু, পরতন্ত্র ও নিকৃষ্ট। পরতত্ত্বই আশ্রয়তত্ত্ব। আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তত্ত্ব আশ্রিত তত্ত্ব।

ইন্দ্রিয়াভিমানী আত্মা—আধ্যাত্মিক, ইন্দ্রিয়ের গোলক—আধিভৌতিক এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—আধিদৈবিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বত্রয় পরস্পরাপেক্ষী। ইহাদের মধ্যে যে কোনটি অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে সমর্থ নয়। ইন্দ্রিয়াভিমানী জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন, অতএব পরতন্ত্র। শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে কহত অভেদ॥"

মাধ্যভাষ্যধৃত জীবেশ্বর-ভেদদ্যোতক বচন-প্রমাণেরও একটি প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা—

গরুড়পুরাণে—

"সর্ব্বজ্ঞাল্পজ্ঞতাভেদাৎ সর্ব্বশক্ত্যল্পশক্তিতঃ।
স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং সম্ভেদেনেশজীবয়োঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু জীব অল্পজ্ঞ; শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব অল্পশক্তিবিশিষ্ট; শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র, কিন্তু জীব পরতন্ত্র। ঈশ্বর ও জীবের এই ভেদ।

শাস্ত্র আরও বলেন—

"স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।"

জীব মায়ার বশীভূত, ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, এই দুইকে তুমি অভিন্ন বলিতেছ? কোথায়

হৃষীকবশ আর কোথায় হৃষীকেশ। শ্রীভগবান্ নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। জীব পরাপেক্ষী, সে তত্ত্বান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে পারে না। মানুষ, কুঠার ও বৃক্ষ এই তিনের সম্মিলনে যেমন বৃক্ষচ্ছেদন সম্ভব হয়, ইহাদের একতমের অভাবে যেমন উহা অসম্ভব, তেমনই আধ্যাত্মিকাদি তত্ত্বত্রয়ের একত্র মিলনেই কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে, অন্যথা উহা অসম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব অন্যনিরপেক্ষ।

জীব কি চাহিতেছে? জীব চায় আনন্দ, আনন্দলাভই উহার নিখিল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। এই আনন্দ জড় বস্তুতে পাওয়া যায় না, উহা পাওয়া যায় চৈতন্যে। আনন্দের পীঠক অজ্ঞান নহে, জ্ঞান। যাহার বোধশক্তি নাই, তাহার আনন্দদানেরও শক্তি নাই। আবার যাহা পরতন্ত্র, তাহাতেও আনন্দ নাই। দেহে আনন্দ নাই, কারণ, দেহ পরতন্ত্র। দেহের ভিতরে যে আলো আছে, তাহার নাম জীব। উহা অণু চৈতন্য, যথা শ্রুতিঃ—

১। এষ অণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ইতি।

অর্থাৎ এই জীব আত্মা অণু ও চিৎলক্ষণ দ্বারা জ্ঞাতব্য। ইহাতে পঞ্চপ্রাণ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

২। বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ॥

—(স্কন্দপুরাণধৃত শ্রুতিবচনম্)

অর্থাৎ সূক্ষ্মকেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করিয়া তাহাকে আবার শত ভাগ করিলে যে পরিমাণ হয়, জীব তদ্‌বৎ অতি সূক্ষ্ম। ইহা অন্য শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে।

যে অণু, সে পরতন্ত্র; যিনি বিভু, তিনি স্বতন্ত্র; কাজেই জীবের স্বরূপজ্ঞানে আনন্দ নাই। পরমাত্মজ্ঞানে ও প্রাপ্তিতেই আনন্দ। মায়াবদ্ধ জীব আমরা নারিকেলের আভ্যন্তরীণ স্বাদু শস্য উপেক্ষা করিয়া বাহিরের খোসা চিবাইতেছি; পরমাত্মতত্ত্ব ভুলিয়া দেহাদিতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছি। দেহাদির সুখচেষ্টাতেই আমরা হয়রান্। দেহাদিতেই আনন্দের বৃথা অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। আনন্দ, কাল, কর্ম্ম ও মায়ার অতীত বস্তু। বেদাদি শাস্ত্র এই আনন্দের সন্ধানই বলিয়া দিতেছেন, তাই শাস্ত্রের এত সমাদর। সাধু এবং গুরুদেব শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানই জীবকে বিতরণ করিয়া থাকেন।

"মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান,
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদপুরাণ।"

—(চৈঃ চঃ।)

উক্ত সম্বন্ধতত্ত্ব এক। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"; কৈবল্য উপনিষদে লিখিত আছে, "গুহাশয়ং নিষ্কলং অদ্বিতীয়ম্।" সকল শাস্ত্র এক তত্ত্বেরই

নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রসমূহের বিবাদ নাই। যে বিবাদ আপাততঃ প্রতীতি হয়, উহা বাস্তব নহে। যাঁহার শাস্ত্রে প্রবেশ আছে, তিনি বিবাদ দেখিতে পান না। তত্ত্ববস্তু এক হইলেও উহার আবির্ভাবভেদ আছে। তত্ত্ব তিন রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, যথা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

তত্ত্ববিদ্‌গণ যে তত্ত্বকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাকে কেহ বা ব্রহ্ম, কেহ বা পরামাত্মা এবং কেহ বা ভগবান্ বলিয়া অভিহিত করেন। বহুগুণাশ্রয় একধর্ম্মী দুগ্ধাদি দ্রব্য যেমন চক্ষুরাদি পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা নানা-রূপে পরিগৃহীত হয়, তদ্রূপ একই তত্ত্ববস্তু উপাসকের উপাসনাভেদে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য আছে, তাহা একই বস্তুর সেই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ এক বস্তু—কিন্তু রূপ-রস-স্পর্শ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় উহার ভিন্ন ভিন্ন বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। চক্ষু উহার শুভ্ররূপ গ্রহণ করে, রসনা উহার রসাস্বাদন করে, স্পর্শ উহার শৈত্যের উপলব্ধি করিয়া থাকে।

সেইরূপ একই অখণ্ড তত্ত্ব জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-রূপে, যোগমার্গে শক্তির কিঞ্চিৎ আধিক্য হেতু কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট অর্থাৎ পরমাত্মরূপে এবং ভক্তিমার্গে অধিকতর শক্তিমত্তা হেতু বিশিষ্টতম অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণ ভগবদ্-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শ্রীচরিতামৃতে ইহার নিম্ন-লিখিত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় :—

"বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাতে দিয়ে ত উপমা॥"

শ্রীগীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, এবং যোগী অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ, যথা :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

শ্রীভগবান্ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই শ্রীগীতাশাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীভগবৎসাধনায় ভক্তিই যে সাধকতম, ইহাই সকল শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাক্য এই যে—

"ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া"

অর্থাৎ আমি অনন্যাভক্তিসাধন দ্বারাই সাধকের 'লভ্য' হই। তিনি আরও বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"

আমি কেবল একমাত্র ভক্তিসাধনার দ্বারাই গ্রাহ্য। অন্যান্য যত সাধন আছে, ভক্তি ব্যতীত তৎসকলই ব্যর্থ। ভক্তি সহযোগেই উহারা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। একমাত্র ভক্তি স্বতঃই সর্ব্বার্থ প্রদান করেন। ভক্তি নিরপেক্ষা, অন্যান্য সাধন ভক্তি-সাপেক্ষ। একমাত্র ভক্তি পরমার্থ-প্রদানে সম্পূর্ণ সমর্থা। সকল বর্ণের ও আশ্রমের পক্ষেই ভক্তির সাধন নিত্য। এ সম্বন্ধে শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥"

আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম নামে আভহিত। ফলতঃ তাঁহারাই প্রকৃত এবং

শ্রেষ্ঠতম যোগী—অর্থাৎ ভক্তিযোগের যোগী। তথাকথিত যোগের সাধনা অপেক্ষা এই ভক্তিসাধনা অত্যুত্তম।

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥"

কামলোভাদিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি মুকুন্দসেবা দ্বারা যেমন শান্তি প্রাপ্ত হয়, যমাদি যোগপথ দ্বারা তেমন শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

ভক্তিযোগে সাধনজনিত কোন ক্লেশ নাই অথচ উহার ফলও অপূর্ব্ব। কেন না, ভক্তিযোগের ফল ভগবদ্বশীকারিত্ব, যথা শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মোক্তি :—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

জ্ঞানের সাধনায় শ্রীভগবান্ বশীভূত হন না। কিন্তু জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্য দ্বারা সৎকার করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন যাপন করেন, শ্রীভগবান্ ত্রিজগতে অজিত হইলেও তাদৃশ ভক্তগণের বশীভূত হইয়া থাকেন, ইহাই উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ।

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মহোদয় এই সকল সিদ্ধান্তবাক্যের সারমর্ম্ম দুই ছত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নাহি বল।"

এ স্থলে ভক্তির লক্ষণসমূহের মধ্যে দুই একটি বচন প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

১। "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"

নিখিল বিষয়ে মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই প্রীতিযুক্ত মমতাবোধকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি প্রেম-ভক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

২। "সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবনের নাম ভক্তি। এই সেবন সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিরহিত অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং ভগবৎপরায়ণত্ব দ্বারা সুনির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই উহা ভক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

৩। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীকৃষ্ণসেবন ব্যতীত অন্য নিখিল অভিলাষবিবর্জ্জিত এবং জ্ঞান, কর্ম্মযোগ ও সাংখ্যজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা অনাবৃত অনুকূল ভাবময় শ্রীকৃষ্ণ-সেবনের নামই উত্তমা ভক্তি।

ভক্তির আরও বহুল লক্ষণ আছে। বিস্তারভয়ে এ স্থলে উহাদের উল্লেখ করা হইল না।

জীব পরমাত্মার বিভিন্নাংশস্বরূপ। পরমাত্মা জীবের প্রভু—ইনিই জীবের সুখ-দুঃখের বিধাতা এবং দেহযন্ত্রের নিয়ন্তা। ইনি ইঁহার চিদাভাস দান না করিলে দেহ ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। পরমাত্মার চিৎশক্তির প্রভাবেই দেহ সজীব থাকে। আত্মার বিনাশ নাই—দেহারম্ভক পরমাণুরও বিনাশ নাই। তবে মৃত্যু ব্যাপারটি কি? দেহাভ্যন্তরস্থ পরমাত্মার আলোক-সংবরণই মৃত্যু। লৌহ স্বতন্ত্রভাবে দহন করিতে অসমর্থ; অগ্নিসংযোগে উহা দহন করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ এই দেহ পরমাত্মার চিদাভাসের সংযোগে সজীব ও সক্রিয় হয়। পরমাত্মা অন্তর্য্যামী, দ্রষ্টা বা সাক্ষী। ইনি দেহের সুখদুঃখাদিতে লিপ্ত হন না। ইনি কর্ম্মফলও ভোগ করেন না। মায়াবদ্ধ জীবের আকুল হাহাকারে তিনি অবিচলিত। শ্রীভগবান্ ইঁহার উপরিচর। শ্রীভগবান্ নরপতিস্থানীয় এবং পরমাত্মা তদধীন বিচারকস্থানীয়। বিচারক অপরাধীর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া বিধানানুসারে দণ্ড দান করেন, ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য, অপরাধীর প্রতি করুণাপ্রদর্শন তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। দয়ার্দ্র-হৃদয় নরপতি

স্বেচ্ছায় অপরাধীকে বিচারকপ্রদত্ত দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারেন। তেমনই পরমাত্মা কেবল বিচারক ও দণ্ডদাতা; শ্রীভগবান্ দীনবৎসল ও করুণাময়; তিনি শরণাগতপালক, তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লইলে তিনি কোলে তুলিয়া লন, জীবের সকল কর্ম্ম ও পাপ নষ্ট করেন। কিন্তু শ্রীভগবানের এই কৃপা স্বতন্ত্রা নহেন, ইনি অপরাধীর প্রতি ভক্তের কৃপাকে বাহন করিয়া গৌণভাবে তাহাকে কৃপা করেন।

ভগবৎকৃপার এক প্রধান সাক্ষী মহাপাপী অজামিল। সেই জন্য অজামিল ও পূতনা উদ্ধারের সংবাদে আমাদের বুকে ভরসা আইসে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার নির্ব্বিকার ভাব বড় কঠোর। ইহাতে প্রাণে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। শ্রীভগবানের কারুণ্যই গভীর অন্ধকারে একমাত্র আশার আলোক।

জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি। তটস্থ শব্দের অর্থ উহা জড় ও চৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী। জীব স্বরূপে চৈতন্য হইয়াও দেহাদিতে অভিমানবশতঃ জড়ত্বের দিকেও উহার গতি পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য উহা চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া তটস্থা শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীভাগবত বলেন :—

"যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতমভিপদ্যতে ॥"

জীবের তটস্থতা চিরস্থায়ী নহে। অনাদি হইলেও এই

ভাবটি সান্ত। জীবের মায়াসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইলেই উহা স্বরূপস্থ হয়। জীব স্বরূপস্থ হইয়া সাধনবলে ভগবৎপার্ষদপদে উন্নীত হয়েন। স্বরূপপ্রবিষ্ট জীব বিশুদ্ধ জীব নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

"স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত, নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নামে ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হ'য়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥"

তটস্থ জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। উহাতে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব। উহার জ্ঞান শুধু দেহেতেই

সীমাবদ্ধ। দেহের প্রীতিই উহার প্রীতি। দেহসম্বন্ধবশতঃই স্ত্রীপুত্রাদি উহার প্রীতির আস্পদ। দেহে আমাদের যে প্রীতি, তাহা শ্রীকৃষ্ণে হইলে উহা রাগাত্মিকা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। সেই অবস্থায় জীব ব্রজপরিকর হইয়া উঠেন।

"কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তিনি আমাদের নিত্যপ্রভু। বহির্ম্মুখতা-স্বভাববশে তাঁহাকে ভুলিয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছি। জানি, স্ত্রীপুত্রাদি আমাদের ছাড়িয়া যাইবে অথবা আমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইব অথচ তাহাদের কল্পিত প্রীতিতেই আমরা মুগ্ধ। এক জন আছেন—যিনি আমাদের কখনও ছাড়েন না। আমরা যখন যেখানে যাই, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

কর্ম্মচক্রে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ জীবের তিনিই নিত্য সহচর। শ্রীবিদ্যাপতি বলিতেছেন—"তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে সমায়াত, সাগর লহর সমানা।"

মোহান্ধ জীব আমরা ইহা জানিয়াও জানিতেছি না। আমাদের উপায় কি? আমাদের একমাত্র উপায়—সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য। এই তিনই আমাদের পরম বান্ধব।

ইঁহারাই শ্রীভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া দেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, জীবের বহির্ম্মুখতা যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে উহা ঘুচিবে কি প্রকারে? ইহার উত্তর—ভগবদ্জ্ঞানের অভাবই জীবের বহির্ম্মুখতার কারণ। উক্ত জ্ঞানাভাব অনাদি হইলেও উহার অন্ত আছে। অভাব দ্বিবিধ;—(১) অন্যোন্যাভাব, (২) সংসর্গাভাব। মানুষে গোত্বের অভাব এবং গরুতে মনুষ্যত্বের অভাবকেই অন্যোন্যাভাব কহে।

সংসর্গাভাব তিন প্রকার;—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংসাভাব, (৩) অত্যন্তাভাব।

জীব চৈতন্যস্বরূপ; উহাতে জড়ের সংস্পর্শ নাই। এ জন্য উহাকে "চিদেকরস" বলা হইয়াছে। কিন্তু উহার দুর্গতির অবধি নাই। "স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।" চিৎস্বরূপ হইয়াও জীব মায়ার কিঙ্কর হইয়া পড়িয়াছে। রাজার ছেলে চামারের ব্যবসা করিতেছে। আমরা চিনি শুধু চামড়া। চামড়াকেই আমরা সাজাইতেছি, সাবান মাখাইতেছি, যত্নপূর্ব্বক উহার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের প্রয়াস করিতেছি। ভিতরের বস্তু আমরা চিনি না। তাই আমাদের এ দুর্গতি। মায়া এ দুর্গতির কারণ। অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্বের জ্ঞানসংসর্গাভাব নিবন্ধন মায়া আমাদিগকে দণ্ড দিতেছেন।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ;
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়;
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।"—(শ্রীচৈঃ চঃ)।

পুনরায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন :—

"কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

তথাহি শ্রীগীতাবচনম্—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

আমার এই দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া; কিন্তু যাঁহারা আমার শরণাগত হন, তাঁহারা আমার এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

"কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"—(শ্রীচৈঃ চঃ)

এই অভাব প্রাগভাব, অর্থাৎ এ অভাব ভবিষ্যতে কখনও যে দূর হইবার নহে, তাহা নয়।

মায়ার দুইটি বৃত্তি :—আবরিকা ও বিক্ষেপিকা। যে বৃত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত হইয়াছে, তাহা মায়ার আবরিকা বৃত্তি, এবং যে বৃত্তি দ্বারা উহার দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়াছে, তাহা মায়ার বিক্ষেপিকা বৃত্তি।

দেহটিকে আমরা 'আমি' বলিয়া মনে করিতেছি এবং সেই জন্য উহাকে সযত্নে লালন-পালন করিতেছি, উহা আমাদের একটি বিষম ভ্রম। এই ভ্রান্তিই আমাদের দুঃখের মূলীভূত কারণ। "দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান।" এই ভ্রান্তির নাশ হইয়া যে দিন আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে, সে দিন আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে।

আমরা দিবারাত্রি ধন-দৌলত, ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বিব্রত। আমাদের সকল কাজের সময় হয়, কিন্তু "আমি কে" ইহা ভাবিবার আমাদের সময় হয় না। আমরা জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু আমার স্বরূপ কি, তাহা জানি না। একদা দশ জন ব্যক্তি স্নানার্থী হইয়া নদীতে আসিয়াছিল। স্নান করিবার পর লোক-গণনায় একটি কম পড়িয়া গেল। প্রত্যেকেই আপনাকে বাদ দিয়া গণিতে লাগিল। তখন তাহারা সাশ্রু-নয়নে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, নিশ্চয়ই এক জন জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। ইহা বলিয়া অধীর হইয়া তাহারা ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমন সময় তথায় এক জন বৃদ্ধ আসিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কারণ জানিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে

উহাদের মধ্যে এক জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দশমস্ত্বমসি"—তুমিই দশম। ইহাতে তাহাদের ভ্রান্তির অপনোদন হইল। সেইরূপ আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। শাস্ত্র আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন, আমি কি বস্তু। ইহাতে যাঁহারা সুকৃতী অর্থাৎ যাঁহাদের জন্মান্তরীণ সাধনা আছে অথবা যাঁহাদের মহৎকৃপাজনিত ভাগ্যোদয় হইয়াছে, তাঁহাদের ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া যায় এবং চিত্তে স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

আমরা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ের আহার সংগ্রহ করিতেছি। কিন্তু আত্মার আহার সংগ্রহ করিতেছি না। আত্মার আহার—"রসো বৈ সঃ।" ইন্দ্রিয়ের আহার সংগ্রহ করিতে হইবে তখন—যখন উহা সংযত হইবে ও শ্রীভগবানে উহাদের বৃত্তিসমূহ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে।

আমরা শ্রীভগবানের ভিতরে রহিয়াছি অথচ তাঁহার কোন খবর রাখি না। যেমন কোন ব্যক্তি কানে কলম রাখিয়া উহার জন্য আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া হয়রাণ হয়, আমাদের অবস্থাও তদনুরূপ। মায়া ঐশ্বরিক শক্তি। জীব অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র শক্তি। কাজেই মায়ার সহিত স্বয়ং লড়াই করিয়া জয়ী হওয়া উহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং উহাকে পূর্ণ শক্তিমান্ শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইলে জীব মায়া জয় করিতে পারিবে।

জীবের মুখ্য দোষ ভগবদ্বৈমুখ্য। সেই দোষ পাইয়া মায়া তাহার স্বরূপ আবরণ করিয়াছে। তাহাকে অহমিকা দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহে জড়াইতেছে। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রাক্তন জন্মের অনুভব, সংস্কার অথবা এ জন্মে মহতের কৃপা দ্বারা জীবের ভগবৎসাম্মুখ্য হইয়া থাকে। এই প্রকার সৌভাগ্যবান্ জীবের পক্ষে কি শাস্ত্রানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা নাই ? অবশ্যই আছে। যাঁহার জন্মান্তরীণ ভগবদনুভব আছে, শাস্ত্রশ্রবণাদিতে তাঁহার সেই পূর্ব্ব-অনুভবের উদ্দীপনা হয়। পুত্র বর্ত্তমানেও যেমন পিতা তাঁহার চরিতালোচনা করিতে ভালবাসেন, কারণ, ইহাতে তাঁহার আনন্দ হয়, তেমনই যাঁহার ভগবদনুভব আছে, শাস্ত্রের উপদেশবাক্যে তাঁহার রসের উদ্দীপনা হইয়া থাকে। জননীজঠরস্থ শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়কে শ্রীনারদ ঋষি ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার ভজন ছিল, কাজেই উপদেশ সফল হইল। শৈশব হইতেই প্রহ্লাদ ভক্তচূড়ামণি হইয়া উঠিলেন। ধ্রুবকে তাঁহার জননী উপদেশ করিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি ব্যতীত তোর দুঃখের নিবারক আর কেহ নাই।" শ্রবণমাত্রই প্রাক্তন অনুভববশতঃ সেই পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুর ভজনে প্রবৃত্তি হইল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

এইরূপ প্রাক্তন অনুভব যাঁহাদের নাই, অথচ এ জন্মে

যাঁহাদের মহতের কৃপালাভ ঘটে নাই, তাঁহাদের পক্ষেও শাস্ত্রোপদেশশ্রবণ হিতকারী।

"যদি নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, বুঝিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥"—(শ্রীচৈঃ চঃ)

অবশ্য শ্রবণমাত্রই এই শ্রেণীর জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে শাস্ত্রোপদেশ-বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু এ বীজ চিন্ময়, কখনও নষ্ট হইবে না, যাহা শুনা গেল, তাহা রহিল। সময়ে সাধুসঙ্গের বাতাসে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলের বর্ষণে উক্ত বীজ অঙ্কুরিত হইবেই হইবে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পান ভক্তি-লতা-বীজ॥
মালী হ'য়া সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কামাসক্ত হৃদয়ে ভগবানের আস্বাদন হয় না। হৃদয় নির্ম্মল, নিষ্পাপ না হইলে শাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মে না। পাপ দূরে গেলে সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে শ্রদ্ধা জন্মে। যখন শাস্ত্রে বিশ্বাসের এবং সদ্‌গুরুতে সৎমতির অভাব, তখন বুঝিতে হইবে, হৃদয়ে মলিনতা রহিয়াছে।

সৎসঙ্গ হইতে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে এবং তাহা হইতে প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাঁহার মুখে ও বুকে কৃষ্ণ, তাঁহার কথা শুনিলে প্রেমাবির্ভাব হইবে।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশপরিচ্ছেদে অষ্টমশ্লোকঃ ঃ—

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥"

অর্থাৎ যিনি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত বা অতিশয় বিরক্ত নহেন, এতাদৃশ ব্যক্তির কোন পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ দ্বারা আমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিলে, তাঁহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ প্রেমফল উৎপাদন করিয়া থাকে।

শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য পরতত্ত্বে। পরতত্ত্বের উপদেশেই তৎপ্রাপ্তি হয় না। আম আছে বলিলেই আম পাওয়া যায় না, পাইবার উপায় জানা চাই। কি করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং তাঁহাকে পাইলে কি হয়, এ সকল জানা চাই।

শাস্ত্রের মুখ্য উপদেশ পরতত্ত্ব। অভিধেয় ও প্রয়োজন আনুষঙ্গিক উপদেশ। অভিধেয় শব্দের অর্থ কর্ত্তব্য।

আমাদের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য-কৃষ্ণোপাসনা। উপ অর্থে সমীপে, আসন অর্থে স্থিতি। দেহের নিকট স্থিতি ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট থাকিতে হইবে। আমাদের ভবরোগের মূলীভূত নিদান ভগবদ্বৈমুখ্য। নিদানবর্জ্জনই সুচিকিৎসা, অতএব উক্ত বিমুখভাব ত্যাগ করিতে হইবে। মায়াকে পশ্চাতে রাখিয়া শ্রীভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। ইহাই উপাসনা—ইহাই অভিধেয়।

আনুগত্য ব্যতীত উক্ত উপাসনা অসম্ভব। জীবের সাধনার শক্তি নাই। অতএব তাহাকে শক্তিমান্ পুরুষের অর্থাৎ যাঁহার ভজনবল আছে, এমন মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥"

শ্রুতি বলিতেছেন—

"আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"

আত্মার বিষয় শ্রবণ, তদ্বিষয়ে বিচার এবং তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনা দ্বারাই পরতত্ত্ব-বস্তু-জ্ঞান আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। যিনি তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তাঁহাকে (সেই সাধককে) জ্ঞান দান করেন। কিন্তু সাধকের শুধু জ্ঞান মুখ্য লক্ষ্য নহে। ভগবদনুভবই তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য। সাপের শরীর শীতল, কেবল এই

কথায় উক্ত শৈত্যজ্ঞান হয় না। সর্পশরীর স্পর্শ দ্বারা শৈত্যের অনুভব হইলেই প্রকৃত জ্ঞান হয়।

কি জ্ঞানী, কি ভক্ত প্রত্যেকের অনুভবই লক্ষ্য। জ্ঞানীর অনুভব শুধু চিত্তে বা হৃদয়ে। ভক্তের অনুভব চিত্তে এবং নয়নে। জ্ঞানীর যাহা আস্বাদন, ভক্তের তো তাহা আছেই, ইহা ছাড়াও ভক্তের কিছু অতিরিক্ত আস্বাদন আছে। জ্ঞানীর কেবল অন্তঃসাক্ষাৎকার; ভক্তের অন্তঃসাক্ষাৎকার ও বহিঃসাক্ষাৎকার। এই অংশে ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

হরি যাঁহার অন্তরে বাহিরে, সেই ভক্তচূড়ামণির তপস্যার প্রয়োজন কি? হরি যাহার অন্তরে ও বাহিরে নাই, সেই অধন্য ব্যক্তির তপস্যারই বা মূল্য কি? তাহার তপস্যা বৃথা শ্রমমাত্র।

এখন আমাদের উপাস্য বা আরাধ্য কে? যাঁহার আরাধনায় সকলেরই আরাধনা হয়, কাহারও আরাধনা বাকি থাকে না, তিনিই আরাধ্য। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতেই সশিষ্য দুর্ব্বাসার পরম তৃপ্তি হইল।

"দুঃখ যাক" এই চীৎকার বৃথা। কেহ বলে না, আঁধার যাক। আলো জ্বালিলেই আঁধার যাইবে। হরি অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত হইলে দুঃখ আপনা হইতেই পলাইবে। যে বস্তু আছে, তৎপ্রাপ্তির জন্যই শাস্ত্র উপদেশ দিয়া থাকেন। যে বস্তু নাই, তাহার জন্য কেহ উপদেশ দেন না। প্রেমধন আমাদের আছে। উহা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। তবে আমরা উহার সন্ধান জানি না, শাস্ত্র তাহার সন্ধান বলিয়া দিতেছেন। এক দরিদ্রের ঘরে পৈতৃক ধনরাশি পোতা ছিল। তাহার পিতা ইহার বিষয় অবগত ছিলেন, আর কেহই জানিত না। দৈবাৎ উক্ত দরিদ্রের পিতা বিদেশে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ দিকে দরিদ্র ধনাভাবে কালাতিপাত করিতেছে, এমন সময় এক সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন,—"হে বৎস, তুমি কেন এত দুঃখ পাইতেছ? তোমার ত পৈতৃক অর্থ রহিয়াছে। ভূমি খনন কর,—অর্থ পাইবে। তোমার দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হইবে। কিন্তু সাবধান! দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে খুঁড়িও না। দক্ষিণে ভীমরুল ও বোলতা আছে, পশ্চিমে এক যক্ষ আছে এবং উত্তরে কৃষ্ণ অজগর আছে। এ সব দিকে খুঁড়িলে ধন ত পাইবেই না, বরং তোমার যন্ত্রণার একশেষ হইবে। পূর্ব্বদিকে অল্প ভূমি খুঁড়িলেই ধন পাইয়া তুমি কৃতার্থ হইবে।" অতঃপর সর্ব্বজ্ঞের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া দরিদ্র ধনলাভে

কৃতার্থ হইল। উক্ত উপাখ্যানে দরিদ্র ব্যক্তি সংসারদুঃখ-পীড়িত জীব-স্থানীয়—ধন,—পরতত্ত্ব-বস্তু-স্থানীয়, সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্র-স্থানীয় এবং দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব যথাক্রমে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান এবং ভক্তি-স্থানীয়। কর্ম্মজ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া ভক্তির শরণাপন্ন হওয়াই নিখিল শাস্ত্রের উপদেশ।

যে পথে গমন করিলে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, শাস্ত্রে তাহার নাম দক্ষিণ অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ বলিয়াছেন। কর্ম্মমার্গে নিরন্তর দুঃখভোগ হয় বলিয়া, কর্ম্মের ফলকে ভীমরুল-বোলতা সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে কেবলমাত্র দুঃখপ্রাপ্তি হয়, ফলতঃ মূলধন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারা যায় না। যোগসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিকট অণিমা-লঘিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়া যোগের বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং এই প্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়া তদুপযুক্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া পরমাত্মতত্ত্বলাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই যোগ-সিদ্ধিকে যক্ষ সদৃশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কারণ, পরমাত্মা নির্লিপ্ত, দ্রষ্টা ও সাক্ষিস্বরূপ। তিনি নিজেও উপভোগ করেন না ও যোগীকেও উপভোগ করিতে দেন না।

জ্ঞানমার্গকে উত্তর দিক বলা হইয়াছে। ঐ পথে ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ অজগর সর্প আছে। যত দিন সাধক সাধনায়

প্রবৃত্ত থাকেন, তত দিন তিনি সমাধিতে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন; কিন্তু সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ কৃষ্ণ অজগর তাঁহাকে গ্রাস করে; সুতরাং তখন তাঁহার অস্তিত্বলোপ হওয়ায় তিনি ব্রহ্মানন্দের অনুভব হইতে বঞ্চিত হন। ভক্তিমার্গকে পূর্ব্বদিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিক ব্যতীত অন্য কোন দিকে উদিত হন না, সেইরূপ ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্তি হয় না।

অনাদি বহির্ম্মুখতা হেতু জীবের প্রায়ই সাধনে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে। আমাদের সেই শৈথিল্য-নিরসনের জন্য পরমকারুণিক শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে ভক্তিসাধনার উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণকে বলিতেছেন—

“শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়,
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।”

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্ :—

“তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥”

ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মিলে ভক্তের কর্ম্মত্যাগ জন্য প্রত্যবায় হয় না। দৃঢ় শ্রদ্ধা উৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ভক্তের কর্ম্মযোগে অধিকার থাকে।

এই শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য। অবিশ্বাস আমাদের মৃত্যু-বাণস্বরূপ। শাস্ত্রের প্রত্যেক কথাই সত্য, আমরা অজ্ঞতা-বশতঃ বৃথা তর্ক করি। দেহাভিনিবেশই আমাদের ভয়ের কারণ। কিন্তু যাঁহার দেহাসক্তির নিবৃত্তি হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহার কোন ভয় নাই।

আশ্রিত বস্তু আশ্রয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সাপের বিষে আমরা মরি, কিন্তু উহা সাপে থাকিয়া সাপের কোন অনিষ্ট করে না।

ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল দ্বারা দর্শকগণকে মোহিত করে, কিন্তু ঐ ইন্দ্রজাল ঐন্দ্রজালিককে ও তাহার শিষ্যগণকে মোহিত করিতে পারে না। সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি মায়া ঈশ্বরকে এবং তাঁহার আশ্রিত ভক্তকে অভিভূত করিতে পারে না।

"সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়া যা সা মায়া।"

অর্থাৎ যাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, তাহাই মায়া।

শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত মায়া কাটাইবার উপায়ান্তর নাই।

ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন সাধনে মায়া নিবৃত্ত হয় না। ভজন করিতে করিতে ভগবানের কৃপার উদয় হইলে মায়ার নিবৃত্তি হইয়া যায়। মায়া ত্রিগুণময়ী; তিন গুণের এক

গুণ ছিঁড়িলেও অন্য গুণ দ্বারা মায়া জীবকে বন্ধন করে। সাত্ত্বিক বাসনা ধর্ম্মপ্রচারাদি—এ সকলও বন্ধনের হেতু। সর্ব্বত্যাগী হইয়াও কোন কোন ব্যক্তি পরিশেষে মঠস্থাপন, ধর্ম্মপ্রচারাদির জন্য লালায়িত হয়েন। মঠপ্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ-ভিক্ষা এবং স্ত্রীপুত্রাদির জন্য অর্থ-ভিক্ষা উভয়ই প্রায় সমান। মনকে রাখিতে হইবে কেবল কৃষ্ণের দিকে, ত্যাগের দিকেও নয়, ভোগের দিকেও নয়। ভোগের ভিতর দিয়াও ত্যাগের ভিতরে যাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয় মহাভোগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন; কিন্তু অন্তরে তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্য ও প্রেম বর্ত্তমান ছিল। চির-বিরক্ত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইয়া তাঁহার ভোগীর বেশাদি দর্শনে একটু সংশয়ান্বিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার অপরিসীম কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। অপ-রাধভঞ্জনের জন্য তিনি অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি-লেন। এই ব্যাপারে গুরুতত্ত্বটি পরিস্ফুট হইয়াছে। গুরু-তত্ত্ব হইতেছে কৃপাতত্ত্ব,—ক্ষমাতত্ত্ব। যিনি ক্ষমা করেন, তিনি গুরু; যাহার ক্ষমা নাই, সে লঘু। শিষ্যের দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে কৃষ্ণনিষ্ঠ করাই গুরুর কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের প্রসন্নতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিসে তিনি প্রসন্ন হইবেন? জ্ঞান দ্বারা তাঁহার

প্রসন্নতালাভ হইবে না। একমাত্র প্রীতিতেই তিনি প্রসন্ন হয়েন। যেখানে প্রীতি, সেখানেই অপরাধের ক্ষমা। জ্ঞানী বিচারনিষ্ঠ। যাহার বিচারশক্তি আছে, তাহার অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে। ভক্ত বিচার জানেন না। তিনি জানেন শুধু ভালবাসিতে, আত্মসমর্পণ করিতে; কাজেই দৈবাৎ তাঁহার অপরাধ উপস্থিত হইলেও শ্রীভগবান্ তাহা ক্ষমা করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে
পঞ্চমাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোক :—
"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চি-
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ অনন্যভাবে স্বীয় চরণভজনকারী প্রিয় ভক্তের প্রমাদবশতঃ কোনরূপে যদি কিছু নিষিদ্ধ কর্ম্ম উৎপতিত হয়, ভক্তের হৃদয়ে অচলভাবে উপবিষ্ট সর্ব্বশক্তিশালী ভগবান্ শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিয়া দেন। তাই বলিয়া জ্ঞান তুচ্ছ করিবার নয়, জ্ঞানযোগ দ্বারা তত্ত্ববস্তুলাভ হইতে পারে। কিন্তু প্রাপ্তির তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ জ্ঞানযোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং কলিযুগের উপযোগী সাধন নহে। ভক্তির সহায়তা বিনা

একেবারেই উহা ফলপ্রদ হয় না। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।"

অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মত যে, শাস্ত্রোক্ত কোন সাধনই মিথ্যা নয়। তিনি সকলকেই কোল দিয়াছিলেন। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব সকলেই তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। "হরিস্তু সেব্যঃ।" তটস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্ববিষয়ে বিরক্ত হইয়া শ্রীহরির ভজন করাই কর্ত্তব্য, কারণ, তাঁহাতে ভজনীয় গুণ আছে। তিনি যে ভজনীয়, সে বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রমাণগুলি দ্রষ্টব্য :—

(১) তিনি স্বচিত্তে অর্থাৎ জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে বর্ত্তমান। তাঁহাকে দূরে যাইয়া খুঁজিতে হইবে না। তিনি অতি নিকটে আছেন।

(২) তিনি স্বতঃই বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার অস্তিত্ব অন্যনিরপেক্ষ অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না।

(৩) তিনি আত্মা, কাজেই জীবের স্বতঃ প্রিয়। আমরা আত্মাকে বড় ভালবাসি। দেহকেও ভালবাসি বটে, কিন্তু দেহের চেয়ে আত্মা আমাদের অধিক প্রীতির আস্পদ।

কারণ দেহ জীর্ণ হইলে সে প্রীতির অযোগ্য হয়, কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের বাঁচিবার সাধ থাকে।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন ঃ—

"জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী।"

(৪) ভগবান্ পারমার্থিক সত্য। সেব্য, সেবক ও সেবা এই তিনই পারমার্থিক সত্য। অসত্য বস্তুকে কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভজনা করেন না।

(৫) তিনি ভগবান্, তিনি ভজনীয় গুণশালী। তিনি দয়ালু, ক্ষমাশীল, ভক্তবৎসল ও ভক্তাধীন।

(৬) তিনি অনন্ত, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। আমরা যেখানে থাকি, সেখানেই তিনি আছেন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

কেমন করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে? "নিয়তার্থ" অর্থাৎ নিশ্চলস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে ভজিতে হইবে।

"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।"

আমি ভগবৎচরণের দাসানুদাস, এই ভাবে তাঁহার ভজন করিতে হইবে।

সর্ব্বদা ভগবদনুভবানন্দে পূর্ণ থাকিতে হইবে। 'আজ ভজন করা হইল, প্রাণে আনন্দ আর ধরে না, কাল হরিকথা

শ্রবণ করা হয় নাই, তাই প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছি,’ এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া ভজন করিতে হইবে। ভজনেই আনন্দ, ভজনাভাবে দুঃখ হইবে।

ভগবান্, ভক্ত এবং ভজন এই তিনই সুখস্বরূপ। ভজনে মায়া আপনা হইতে দূর হয়।

সূর্য্যের অনুদয়ে জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। সূর্য্যের প্রথম উদয়ে সুদীর্ঘ ছায়াপাত হয়। যতই সূর্য্য গগনমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই ছায়ার কলেবরও হ্রাস হইতে থাকে। যখন সূর্য্য মস্তকোপরি আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ছায়া আমাদের পদতলে পতিত হয়। তেমনি হরি-সূর্য্যের চরণতলে মাথা রাখিলে মায়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইবে। মায়া গেল না, এ দুঃখ করা বৃথা; ভজন হইল না, এ দুঃখই প্রকৃত দুঃখ। এ ছাড়া আর দুঃখ নাই।

জীব শক্তিহীন বলিয়া তাহার কোন শক্তিযুক্ত সাধন-প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানসাধন দ্বারা অর্থাৎ তৎ-পদার্থ ও ত্বম্-পদার্থের ঐক্যভাবনা দ্বারাও পর-তত্ত্বের সাম্মুখ্য লাভ করা যায়। কারণ, উহা দ্বারা ব্রহ্মরূপ পরতত্ত্বের অনুভব হয়। সাঙ্খ্য, অষ্টাঙ্গযোগ এবং নিষ্কাম কর্ম্ম পরম্পরারূপে জ্ঞান-সাধনে উপযোগী, অতএব এ সকল সাধনও পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যজনক। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেককে সাঙ্খ্য বলা হয়। ভগবৎগীতায় সাঙ্খ্য শব্দের

ব্যখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়া ইতি সঙ্খ্যা সম্যক্জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানম্ আত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যম্," অর্থাৎ যদ্দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহাই সংখ্যা, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বপ্রকাশক সম্যক্ জ্ঞান। শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অনুষ্ঠান-সমূহই কর্ম্ম নামে খ্যাত। যোগ অর্থে চিত্তবৃত্তিনিরোধ। ইহার অষ্ট অঙ্গ। যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া নিত্য-নৈমিত্তক ক্রিয়ার অনুশীলনই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই সাধন-ত্রয় দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্তশুদ্ধির পরে জ্ঞানে অধিকার জন্মে। গ্রন্থকর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিচরণ উক্ত সাধনসমূহকেও পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যজনক বলিয়াছেন।

সোঽহং জ্ঞান সহজসাধ্য নয়। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে উক্ত সাধনে অধিকার হয় না। আমাদের মলিন চিত্ত; ইহাতে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ-বাসনা অতি প্রবল। এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে 'তিনিই আমি' এইরূপ বলাও অসঙ্গত এবং অপরাধজনক।

উক্ত সাধনসমূহের সহিত ভগবৎসম্বন্ধ থাকিলে ইহারা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবৎ-আদেশে যদি কর্ম্ম করা হয় এবং ভগবানে যদি সর্ব্বকর্ম্ম অর্পিত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মকে ভক্তি বলা যায়। অন্যত্র অনাসক্তি প্রভৃতি দ্বারা যদি জ্ঞান, ভক্তির সচিব বা সহায়করূপে

প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত জ্ঞানকেও ভক্তি বলা যায়। কিন্তু কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণ ভক্তিই বিশুদ্ধা ভক্তি।

"ভক্ত্যা ভজেত", "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞান অনাদৃত হইয়াছে এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ ভক্তিতেই ভগবান্ প্রসন্ন হন। তাই বলি, হে জীব! তুমি বিশুদ্ধভাবে ভজন কর। তুমি যদি চাহিতে না জান, তাহা হইলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। শ্রীভগবান্ তোমার প্রয়োজনানুসারে উপযুক্ত বস্তু দান করিবেন। তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তিনি তোমার সব সমাধান করিবেন।

ভজন করিতে করিতে বিঘ্ন আসিবে। এ সকল বিঘ্ন শ্রীভগবানের পরীক্ষা অথবা এ সকল সুরকৃত বিঘ্ন। কোনও ভাগ্যবান্ জীব ভজন করিতে আরম্ভ করিলে দেবতাদের ভয় হয় যে, উক্ত জীব তাঁহাদের অধীনতা ছিন্ন করিয়া উপরে উঠিবে, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা ভক্তের উর্দ্ধগমনের পথ বিঘ্নরূপ কণ্টকে কণ্টকিত করিতে যত্নবান্ হন। কিন্তু ভক্ত ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্; তিনি সকল কণ্টক পদদলিত করিয়া অক্ষতচরণে অনায়াসে ভগবৎসকাশে চলিয়া যান।

ভক্তি ভারতের সম্পত্তি। শিশুকাল হইতেই ভারত-বাসী ভক্তি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। ভূমিতে অবনত

মস্তকে প্রণাম করা ভারতবাসীর একটি বিশিষ্টতা। অন্য কোনও দেশে এ সুন্দর প্রথাটি নাই। ইহা ক্ষমালাভের অব্যর্থ উপায়। পায়ে পড়িলে অতি পাষাণহৃদয়ও গলিয়া যায়। ভক্তির সাধনা হৃদয়ের স্বাভাবিক সাধনা। অতএব হে ভারতবাসী মানব, যদি পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতির ফলে ভারতে মানব-জন্ম লাভ করিয়াছ, তাহা হইলে সুযোগ হারাইও না। বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনা দ্বারা আপনাকে কৃতার্থ কর।

যত প্রকার সাধন আছে, সকলই ভক্তির উপযোগী। সকল সাধনই ভক্তির সহায়ক। অর্থাৎ ভক্তিসাধনই সাধ্য নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। ইহাই গোস্বামিচরণের অভিপ্রেত।

যিনি সাধন করেন, তিনি সাধক। যাহা দ্বারা সাধনা হয়, তাহা সাধন। যাঁহাকে সাধা হয়, তিনি সাধ্য। যিনি অপ্রসন্ন, তাঁহাকেই আমরা সাধিয়া থাকি। 'সাধক' এই বাক্যটি দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, কেহ অপ্রসন্ন আছেন, তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। ভগবৎপ্রসন্নতাই সাধনের লক্ষ্য। কর্ম্ম জড়, কর্ম্ম দ্বারা ভগবৎপ্রসন্নতালাভের চেষ্টা বৃথা। কর্ম্মের নিবেদনে শ্রীভগবান্ কর্ণপাতও করেন না, জ্ঞানকে তো এক কথায়ই বিদায়। জ্ঞানকে শ্রীভগবান্ বলিবেন, "অজ্ঞানের মত কেন কথা বলিতেছ? এমন কর্ম্ম যে করে, তাহার প্রতি কি প্রকারে প্রসন্ন হওয়া যায়?"

যোগের নিবেদনও সেইরূপ শ্রীভগবানের গ্রাহ্য নয়। কাজেই সাধককে একমাত্র ভক্তিদেবীরই শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি, ইনি তাঁহার প্রণয়িনী। ভক্তি দ্বারাই তিনি বশীভূত। "বশীকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎপতিং সৎস্ত্রিয়ো যথা" অর্থাৎ সতী রমণী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করেন, তেমনি সতী রমণী ভক্তি সৎপতি শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করেন। ভক্তি দেবীর নিবেদন শ্রীভগবান্ উপেক্ষা করিতে পারেন না। কাজেই ভক্তিই সাধকের একমাত্র আশ্রয়ণীয়া। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত আমাদের জন্মজন্মকৃত অপরাধের মার্জ্জনা হওয়া অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, একমাত্র ভক্তিই ঐকান্তিক মঙ্গলসাধনের হেতু। মূলে যে ধর্ম্মপদের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। যে ধর্ম্মসাধনে শ্রীভগবানে অপ্রতিহতা এবং অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হয়, তাহাই পরম ধর্ম্ম। তথা হি শ্রীভাগবতে :—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

এই ভক্তির অপর নাম পরা ভক্তি। ইহাতেই আত্মপ্রসাদ জন্মে। উহাই ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ। যে ধর্ম্মসাধনের ফলে তাহা হয় না, উহা পণ্ডশ্রম মাত্র। সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত

ধর্ম্মের সংসিদ্ধি,—হরির সন্তোষ অর্থাৎ হরিসন্তোষার্থ কৃত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মমাত্রই শ্রেষ্ঠ নয়।

আমাদের মুখ্য দোষ;—ভগবদ্‌বৈমুখ্য। বৈমুখ্য থাকিলে জীবের সংসারের মূলীভূত নিদান রহিয়া যায়। গীতাশাস্ত্রে নৈষ্কর্ম্ম্যের বহুল মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সেই নৈষ্কর্ম্ম্য ভগবদ্ভাববিবর্জ্জিত হইলে শোভনীয় হয় না। শ্রীনারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষিকে এই কথাই বলিয়াছেন:—

তথা হি শ্রীভাগবতে ১।৫।১২।—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"

অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিবর্জ্জিত হইলে যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে না, তখন সাধন-কালে এবং ফলকালে দুঃখপ্রদ কাম্য-কর্ম্মের ত কথাই নাই। নিষ্কাম কর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত করিতে পারে না। কেবলমাত্র হরিতোষণই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হইলে উহা সাধু; নচেৎ উহা অসাধু।

ভগবৎসম্বন্ধবর্জ্জিত কর্ম্মই আমাদিগের ব্যাধি। প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমরা ঐ প্রকার কর্ম্ম

করিয়া থাকি। শাস্ত্র কর্ম্মের বিভাগ করিয়া দিয়াছেন; কোন কর্ম্মকে বৈধ এবং কোন কর্ম্মকে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। আমরা কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। সেই জন্য শাস্ত্র আদেশ করিতেছেনঃ—"নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জনকরতঃ বৈধকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক করিয়া যাও।" এই প্রকার ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মও হরিতোষণের হেতু এবং ইহা হইতেই হরিকথা-শ্রবণাদিতে রুচিলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম হইতে একটি স্বতন্ত্র বস্তু। উক্ত রুচি, শ্রদ্ধার পূর্ব্বাবস্থা।

ভক্তির স্বরূপ গুণ বলিলেন যে, উহা অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা; অহৈতুকী শব্দের অর্থ ফলান্তররহিতা। সকল ফলেরই লক্ষ্য,—সুখ। ভক্তি পরমানন্দরূপা; কাজেই তৎপ্রাপ্তিতেই নিখিল ফলপ্রাপ্তি হয়। অপ্রতিহতা শব্দের অর্থ—যাহার সাধনে কোন বাধা-বিঘ্ন নাই। বিক্ষেপই বিঘ্ন। সাংসারিক সুখ-দুঃখই উক্ত বিক্ষেপের হেতু। ভক্তি অপেক্ষা সুখকর আর কিছুই নাই। ভক্তির অভাবের অপেক্ষা দুঃখকর আর কিছুই নাই। ভজন করিলে ভক্তের যে সুখোদয় হয়, তাহার তুলনা হয় না। ভজন না করিলে তাঁহার যে কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাও অবর্ণনীয়। এই জাতীয় সুখ-দুঃখ ভিন্ন অন্য সুখ-দুঃখ তাঁহার লক্ষ্যের মধ্যে আসে না। এই জন্য ভক্তের বিক্ষেপ সম্ভব হয় না। ভক্তিরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ এই যে, শ্রীভগবান্ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া

ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বসাধনার অপেক্ষা ভক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীয় লীলায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ভক্তির এক স্তর হইতে অপর স্তরে যাইবার প্রতি হেতু কি? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, নিম্ন শ্রেণীর ভক্তির অনুশীলনের ফলে উচ্চ শ্রেণীর ভক্তির সোপানে সাধকগণ উত্তরোত্তর আরূঢ় হইয়া থাকেন। শিক্ষার্থীদের বর্ণজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অধ্যয়নে রুচির উদয় হয় এবং ক্রমেই পাঠ করিতে করিতে উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠে অধিকারী হয়, সেই প্রকার সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে সাধকের ক্রমশঃ ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি চিত্তবৃত্তিতে স্ফুরিত হয়।

শ্রীভাগবত বলেন—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হয়, তাঁহার শরীরে সর্ব্বগুণের সহিত দেবতাগণ বাস করেন। ভজনের ফলে তাঁহার ভগবৎস্বরূপাদি জ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকাররাশি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়, সেইরূপ

ভগবদ্ভক্তির জ্যোৎস্নাচ্ছটায় কুবাসনারূপ অন্ধকার ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস্ গোস্বামী মহোদয়কে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

অন্যত্রও তিনি শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামিদ্বয়কে বলিয়াছেন ঃ—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

পরপুরুষাসক্তা নারী গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিয়াও যেমন মনে মনে নিরন্তর পরপুরুষের নবসঙ্গরূপ রস আস্বাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ গৃহস্থ বৈষ্ণবও গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও নিরন্তর মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

যেমন লৌহ নিরন্তর অগ্নিসংযোগে অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যিনি যাঁহাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তিনি তাঁহার গুণ প্রাপ্ত হন।

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে॥

—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে ঃ—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রয়োজিত হইলে অচিরেই বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞানের উদয় হয়। যে জ্ঞান শুষ্ক তর্কাদির অগোচর, তাহাই অহৈতুক জ্ঞান। বস্তুর অনুভবজনিত জ্ঞানই—রসাল জ্ঞান। অপর পক্ষে অনুভববিহীন কেবল বাগাড়ম্বরপূর্ণ অসার তর্কজনিত জ্ঞানকে শুষ্ক জ্ঞান বলে। প্রাগুক্ত অহৈতুক জ্ঞানের অপর নাম ঔপনিষৎ জ্ঞান অর্থাৎ উপনিষৎ বা বেদান্ত-প্রতিপাদিত জ্ঞান। উক্ত জ্ঞান ও বিষয়-বিরক্তি ভক্তিসাধন হইতেই হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্রহ্ম-উপাসনা করেন, তাঁহারা এই জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের জন্য নানা প্রকার প্রয়াস পাইয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তিসাধনায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য আনুসঙ্গিক ফল। উহার জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে ধর্ম্মসাধনে শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণাদিতে রুচি জন্মাইয়া থাকে, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ঐ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা অন্বয়মুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা পরিকীর্ত্তিত

হইয়াছে। ব্যতিরেক-মুখেও শাস্ত্র, উক্ত তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যথা ঃ—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি শ্রীভগবানের কথায় রুচি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে তাদৃশ ধর্ম্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। ব্যতিরেকমুখে যে শাস্ত্রবাক্য দৃঢ় করা হয়, তাহাই প্রবলতর। শ্রীভগবানের কথায় রুচির উপলক্ষণে ভক্তির অন্যান্য অঙ্গেও রুচি বুঝাইতেছে। এ স্থলে উপলক্ষণ কাহাকে বলে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যেমন "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাং"—অর্থাৎ কাক সকল হইতে দধি রক্ষা কর। এই উক্তিতে যে কাকের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা উপলক্ষণমাত্র। কাককে উপলক্ষ করিয়া দধিখাদক বা দধি-নষ্টকারক অপরাপর প্রাণীকেও বুঝান হইল। ইহাই উপলক্ষণের উদাহরণ। এইরূপ শাস্ত্রে যে শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণের রুচি বলা হইয়াছে, উপলক্ষণ দ্বারা ভক্তির কীর্ত্তনাদি অঙ্গেও রুচির কথা বুঝিয়া লইতে হইবে।

স্থূলতঃ ধর্ম্ম দুই প্রকার ঃ—(১) প্রবৃত্তিলক্ষণ এবং (২) নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। এই দুই প্রকার ধর্ম্মের আবার বহুল ভেদের বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল যে স্বর্গাদি, তাহা ক্ষয়িষ্ণু, অর্থাৎ সেই ফলের নাশ হইবে। প্রবৃত্তিমার্গের সাধকের লক্ষ্য,—ভোগ; আর নিবৃত্তিমার্গের সাধকের লক্ষ্য,—ত্যাগ। নিবৃত্তিমার্গীয় সাধকগণ জ্ঞানী ও ভক্তভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানীর লক্ষ্য,—আত্ম-সুখ; ভক্তের লক্ষ্য—ভগবানের সুখ। যেমন দর্পণ মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হইলেই যে উহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইবে, ইহা বলা যায় না। দর্পণ সূর্য্যের দিকে উন্মুখ করিয়া রাখিতে হইবে। নিরন্তর ঐরূপে সূর্য্যের দিকে রাখিলে কোন সময় সূর্য্যের প্রতিবিম্ব উহাতে পড়িবে। সেইরূপ ভগবানের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে অর্থাৎ নিরন্তর ভক্তিসাধন করিতে হইবে ও তাহা দ্বারা চিত্ত-দর্পণ নির্ম্মল হইবে। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই যে প্রেমপ্রাপ্তি হইবে, তাহা বলা যায় না। যখন ভগবানের কৃপা হইবে, তখন প্রেমলাভ ও ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে।

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"—শ্রীচৈঃ চঃ।

উপনিষৎ বলেন:—"যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ।" যাঁহাকে তিনি (ভগবান্) বরণ করেন, তিনি (সেই সাধক) তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) প্রাপ্ত হন। লৌকিক ভাষায় বরণ শব্দের অর্থ এই, যেমন শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে গুরু

বা পুরোহিতবরণ অর্থাৎ তাঁহাদিগকে নিজের অর্থাদি বা বস্ত্র দান করা। ভগবান্ সাধককে বরণ করেন অর্থাৎ নিজের কিঞ্চিৎ শক্তি তাহাকে দান করেন। সেই শক্তি-বলে সাধক তাঁহাকে লাভ করেন। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে পাইবার উপায়। ভক্তিবিহীন ত্যাগী তাঁহাকে কখন পায় না। কারণ, সে কখন ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হয় না। ভক্তিবিহীন জ্ঞান, ভগবৎসাধনায় কোনও ফল প্রদান করে না। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

অর্থাৎ নিখিল মঙ্গলের জননীরূপা ভক্তিকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে দূরে রাখিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করেন, তাঁহাদিগের শুধু ক্লেশই সার হয়। যেমন তণ্ডুলকণাবিহীন স্থূল তুষরাশিকে অবঘাত করিলে তাহা হইতে কোন প্রকার শস্যলাভ হয় না, প্রত্যুত হস্তবেদনাই সার হইয়া থাকে, ভক্তিবর্জ্জিত কেবল জ্ঞানলাভের প্রয়াসও তদ্রূপ।

শ্রীভাগবতে আরও লিখিত হইয়াছে যে—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥”

অর্থাৎ হে অরবিন্দাক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এমন অপর এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আপনার প্রতি তাঁহাদের ভক্তির অভাব বশতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। ইঁহারা বহুল কঠোর সাধনায় অতি উচ্চ পদে আরূঢ় হইলেও আপনার শ্রীপাদপদ্মে অনাদর বশতঃ তথা হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-ভজন-বিহীন ব্যক্তিগণ আশ্রয়-বর্জ্জিত হওয়ায় সাধনার উচ্চ রাজ্যে অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন না। শ্রীভগবানের পাদপদ্মই সাধকের অবলম্বন বা খুঁটিস্বরূপ। এই প্রমাণ-বাক্যে যে অবিশুদ্ধ বুদ্ধির কথা বলা হইল, তৎসম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে উহাকে যেমন অগ্নিতে বিগলিত করিতে হয়, সেইরূপ ভক্তির সংযোগে সাধকের হৃদয় বিগলিত হয়। এই উপায়ে বুদ্ধিদোষ বিনষ্ট হয় এবং উহা বিশুদ্ধ হয়। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে—“গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ।” বাক্যটি খুব সংক্ষিপ্ত। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীগোবিন্দের নামই অনলস্বরূপ। শ্বাসের প্রতি ফুৎকারে এই নামরূপ অনল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিতে পারিলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্পাপ থাকা যাইতে পারে।

শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনরূপ ভক্তি দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ভক্তিবিহীন হৃদয় অপরাপর সাধনায় কিয়ৎ-পরিমাণে শুদ্ধ হইলেও পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

সাধনার পথে জ্ঞানীর কি প্রকার বিপদ ঘটিতে পারে, একটা উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইতেছি। দুই ব্যক্তি কোনও গন্তব্য স্থানে চলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হৃষ্টপুষ্ট ও সবল, অপর ব্যক্তি রুগ্ন ও দুর্ব্বল। সবল ব্যক্তি শুধু পথ চেনেন না, কিন্তু তাঁহার অন্য কোন অসুবিধা নাই। শুধু পথের সন্ধান পাইলেই তিনি আপন শক্তিতে চলিয়া যাইতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। দুর্ব্বল ব্যক্তি পথও চেনেন না, চলিবারও শক্তি নাই। উভয়ে পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময়ে অপর এক ব্যক্তি সঙ্গী মিলিয়া গেল। দুর্ব্বল ব্যক্তি একান্তভাবে তাঁহার শরণাপন্ন ও সঙ্গী হইলেন। সবল ব্যক্তি পথের পরিচয় পাইয়াই সঙ্গীর অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে চলিতে লাগিলেন। দুর্গম পথ। বলিষ্ঠ ব্যক্তির পদস্খলন হওয়াতে তিনি পড়িয়া গেলেন। সঙ্গী ইহা দেখিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কিন্তু তিনি পদে পদে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা উভয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। কিন্তু সবল ব্যক্তি রাস্তায় পড়িয়া রহিলেন।

জ্ঞানী অভিমানী। তিনি আপনাকেই ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করেন। ব্রহ্ম বলিয়া অন্য স্বতন্ত্র বস্তু তাঁহার চিন্তার

বিষয়ীভূত নয়। এ অবস্থায় কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? ভক্ত শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাই তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন।

শাস্ত্রে ভক্তিবিহীন জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে বহুল যুক্তিপ্রমাণ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভক্তি-সন্দর্ভ গ্রন্থে ইহার সবিস্তার বিচার দেখিতে পাইবেন। এ স্থলে ভক্তি-সন্দর্ভীয় কতিপয় মূলকর্ত্তব্যতার উল্লেখ করা যাইতেছে। বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠানের মধ্যে অর্চ্চনা একটি প্রধান অঙ্গ। দীক্ষা-গ্রহণের পরে শ্রীভগবদর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। এই নিমিত্ত বৈষ্ণব সাধকগণ শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চনা করেন। যে সকল শুষ্কজ্ঞানী শ্রীভগবানের চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে মায়িক বলেন, তাঁহাদের শ্রীভগবানের প্রতি যে শুধু অনাদর করা হয়, তাহা নয়। ইহাতে ঘোরতর অপরাধ হইয়া থাকে। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীপ্রকাশানন্দমিলনে লিখিত হইয়াছে ঃ—

“তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া তাঁরে কহে নিরাকার॥”

* * * * *

বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর॥

অপিচ শ্রীসার্ব্বভৌমশিক্ষায়—

"ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যম দণ্ডী।"

পুনশ্চ মধ্যের সপ্তদশে :—

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥"

ফলতঃ ভগদ্ভজনই পরমধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মই সফল, যাহা হইতে হরিভক্তির উদয় হয়। অন্যথা উহা বিফল। সাধারণ লোকেরা মনে করে, ধর্ম্ম করিলে বিষয়ভোগ-সুখ-লাভ হইবে, তাহা নয়। ধর্ম্মের ফল অপবর্গ, ইহাই শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্ত। অপবর্গ শব্দের একটা অর্থ মুক্তি, কিন্তু শ্রীপাদ সন্দর্ভকার মহোদয় ভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের একটি গদ্য-নিহিত অপবর্গ শব্দের স্বামিপাদের ব্যাখ্যাবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অপবর্গ শব্দের অর্থ ভক্তি। সুতরাং ধর্ম্মের ফল ভক্তি।

শাস্ত্রকার বলেন :—

"ধ্রিয়তে ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ স এব পরমঃ প্রভুঃ"

অর্থাৎ স্খলিত বা পতিত ব্যক্তিকে যিনি ধরিয়া তোলেন বা পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে যিনি ধরিয়া রাখেন, তিনিই ধর্ম্ম। তিনিই নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, সুতরাং পরম প্রভু। সোজা কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলা যায়, যে সরে, বা পড়ে, তাহাকে যিনি ধরিয়া তোলেন, তিনিই ধর্ম্ম। যাহা সম্যক্-প্রকারে সরে, তাহাই সংসার, যাহা চলিয়া যাইতেছে, তাহাই জগৎ। এই নশ্বর জগতে আমাদের দেহাভিমানই সংসার। দেহাভিমানী বলিয়াই আমরা সরিয়া পড়িতেছি। আমাদের স্থিরতা নাই, সুতরাং আমরা সংসারী। এই সংসার বা সংসরণ হইতে যিনি আমাদিগকে সংরক্ষণ করেন, তিনিই ধর্ম্ম। যাহার অনুষ্ঠানে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই পরম ধর্ম্ম। ভক্তির দ্বারাই আমাদের সরা বা পড়া নিবৃত্ত হইবে। ভক্তির দৃঢ় বন্ধনে যদি আমরা আমাদের হৃদয় শ্রীভগবানের শ্রীচরণে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ না করি, তাহা হইলে কর্ম্মস্রোত আমাদিগকে কালসাগরের অনন্ত বক্ষে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের উপর কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে আমা-দিগকে আকর্ষণ করিবেন, শ্রীচরণে বাঁধিয়া রাখিবেন। এই বন্ধনের জন্যই তিনি বন্ধু। বেদ বলেন—"বন্ধনাৎ বন্ধুঃ।" ৮

ভক্তিকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এখানে মুক্তি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীভগবানে অনন্যা ভক্তির উদয় হইলেই জীব সর্ব্বপ্রকার কামনার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সেবানন্দ প্রাপ্ত হন। জীব

স্বরূপতঃ বদ্ধ নহে। গুণসম্বন্ধ বশতঃই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

অর্থাৎ আমার এই দৈবী ও গুণময়ী মায়া অতিক্রম করা কষ্টকর। কিন্তু যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। মায়া বন্ধনের হেতু ; মায়া গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা ; এইখানেই বন্ধনের দড়ী বিদ্যমান। দড়ী যতক্ষণ,—বন্ধনও ততক্ষণ। এই দড়ী কাটিলেই মুক্তি। যত দিন স্থূল দেহাদিতে আবেশ থাকিবে, যত দিন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা থাকিবে, তত দিনই জীবের বদ্ধাবস্থা। মায়ার অপর পারে গেলেই জীবের মুক্তি। মুক্তি নিশ্চলা ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল। যে ভক্তি কাঁপে না, তাহাই নিশ্চলা। তিন গুণের বাতাসে যে ভক্তি কাঁপে, তাহা পরা ভক্তি নহে, স্থিরা ভক্তিও নহে, অব্যভিচারিণী অপ্রতিহতা ভক্তিও নহে। জল যতক্ষণ জলীয় তরলাবস্থায় থাকে, ততক্ষণই তাহা চঞ্চল,ততক্ষণই তাহাতে তরঙ্গ, কিন্তু ঘনীভূত হইয়া যখন বরফ হয়, তখন আর তাহার চঞ্চলতা থাকে না, কম্পনও থাকে না, তরঙ্গও থাকে না। মুক্তি এই ভক্তিরই অবান্তর অবস্থাবিশেষ। যে ধর্ম্মের আচরণে এইরূপ ভক্তির উদয় হয়, তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষ—এই তিনকে ত্রিবর্গ বলা হয়। ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, এখন অর্থের ফলের কথা বলা হইতেছে। অর্থের ফল ভোগ নয়। অর্থের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণ-ধর্ম্ম সাধন কর। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ স্থাপন, তীর্থাদি ভ্রমণ, উৎসব ও বৈষ্ণব-ভোজনাদি ব্যাপারে অর্থব্যয় কর। যাহাতে নিজের ও পরের ভক্তি জন্মায়, তাহাই কর ; অর্থ অনর্থ নয়—যদি উহার সদ্ব্যবহার করা হয়।

ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা—সাধনই বিষয়-ভোগের তাৎপর্য্য নহে। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ করিবে অর্থাৎ ব্যবহার বিষয়ে যতটুকু করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যতটুকু না করিলে নয়, ততটুকুই করিবে ; শরীর সুস্থ রাখা দরকার। যে পরিমাণ বিষয়-ভোগ শরীররক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, সেই পরিমাণ বিষয়ই গ্রহণ করিবে। আমাদিগকে জীবনধারণ করিতে হইবে, বাঁচিয়া মানুষ হইতে হইবে। এত দিন মানুষের মত কাজ কর নাই, তাহাতে কি ? কিন্তু বর্ত্তমান তোমার হাতে আছে, ভবিষ্যতে যে সময়টুকু আছে, তাহাই যথেষ্ট। অনেকের শেষ জীবন সদ্‌ভাবে কাটিয়া যায়। জীবনের অপরাহ্ণেও সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সুমতি হইতে পারে। বৃদ্ধবয়সে ইন্দ্রিয় সকল অপটু হইলেই বা তাহার কি ক্ষতি ? ভগবৎ-বিষয়-ভোগ ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ নয়। তাঁহার কৃপাই তাঁহার আস্বাদনের কারণ।

সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন দোষাবহ নহে। সঞ্চয়বুদ্ধিই বড়

দোষের। উহাই ভজনের প্রতিকূল। ভজনের জন্য প্রাণ-ধারণ মাত্রায় বিষয়ভোগ অন্যায় নহে। আপনার মৃত্যুর পরে আপনার ছেলে হয় তো সব উড়াইয়া দিবে। পরিবার প্রতি-পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সে জন্য মোটাভাত মোটা-কাপড়ই যথেষ্ট। গ্রাসাচ্ছাদনে বিলাসিতার কি প্রয়োজন?

জীবন ধারণ করিবার প্রয়োজন,—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। তত্ত্ব-বস্তু কি? তাহার উত্তর দিতেছি। আমাদের জ্ঞান,খণ্ড-জ্ঞান। কেহ হয় তো লেখাপড়া জানে, কিন্তু গাড়ী চালাইতে জানে না; আবার যে গাড়ী চালাইতে জানে, সে হয় তো লেখা-পড়া জানে না। কেহ হয় তো প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ.দেশ-বিদেশে তাঁহার নাম; কিন্তু তাঁহার হয় তো চিত্রবিদ্যায় কোন অভিজ্ঞতা নাই। মায়িক জীব কখনও সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানী হইতে পারে না। যাঁহাকে জানিলে সব জানা হয়, যাঁহার কথা শুনিলে, সব শোনা হয়, যাঁহাকে দেখিলে সব দেখা হয়, তাঁহাকেই জানিবার জন্য সাধন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল রূপসনাতন না জানিতেন, এমন কিছুই নাই। তাঁহাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহাদের কত বিষয়ে জ্ঞান। রান্না করার প্রণালীও তাঁহাদের জানা ছিল। কারণ, তাঁরা যাঁকে জানিতেন, তাঁকে জানিলে সব জানা হয়।

তাই সসীম তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিও না। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিজ্ঞানই নয়। উহাতে শুধু কতকগুলি জড় বিষয়ের

জ্ঞান হয় মাত্র। যে বস্তু দ্বৈত-রহিত, তাহাই তত্ত্ব-বস্তু। শ্রীভাগবত বলেন ঃ—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।"

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহাতে স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই, তিনিই অদ্বয় তত্ত্ব। জ্ঞানই তাঁহার স্বরূপ। জড় নিজে প্রকাশিত হইতে পারে না, জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশমান। অর্থাৎ উহার প্রকাশ অন্য-নিরপেক্ষ। অন্যাপেক্ষী জ্ঞান তত্ত্ব নয়। উহা জড়।

তিনি এক। তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই নাই। তদ্‌ব্যতিরিক্ত অপর যাহা কিছু আছে বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা স্বতন্ত্র নহে। তাঁহারই শক্তি। সেই সকলকে লইয়া তিনি এক। শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই, আর কেহই নাই। শিব-ব্রহ্মাদিও কৃষ্ণছাড়া নহেন। তিনি ছাড়া তাঁহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। স্বয়ং ভগবান্‌ এক। জীব অনন্ত, পরম তত্ত্ব এক ভিন্ন দুই নহেন। সেই একের ভিতরেই বহুর অবস্থান। সে সকলই তাঁহারই। শিব ব্রহ্মা তাঁহারই গুণাবতার। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহারই বিভূতি। জীবগণ অনন্ত, ইহারা এক-মাত্র পরমাত্মারই তটস্থা শক্তি। অনন্ত বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির অভিব্যক্তিমাত্র। অন্যান্য

দেবতা-সকলকে তাঁহা হইতে পৃথকভাবে দেখা ভ্রম। এইরূপেই তাঁহার অদ্বয়ত্বের ধারণা করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে কথিত হইয়াছে ঃ—

"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥"

এই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু জানিবার জন্য জীবন রক্ষার প্রয়োজন। সসীম খণ্ডজ্ঞান লাভের প্রয়াসে যেন জীবন না যায়। এই তত্ত্ব-বস্তু এক হইলেও ইনি ত্রিবিধ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যথা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্; তত্ত্ব-বস্তুর ধর্ম্ম গ্রহণ-ভেদে বিভিন্নরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। জ্ঞানীর সাধনায় তিনি চিদেকরসরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে. যোগীর সাধনায় মায়া ও জীবের নিয়ামক অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে এবং ভক্তের সাধনায় পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। একই ব্যক্তি যখন নৃত্য করে, তখন নর্ত্তক, যখন বাজায়, তখন বাদক, যখন গান করে, তখন গায়ক নামে অভিহিত হয়। সেইরূপ পরমতত্ত্বও সাধকগণের ভাব-ভেদে উক্ত ত্রিবিধরূপে

দ্রব্য দ্বারা পারদকে বিভাবিত করেন, পরিশোধিত করেন এবং গন্ধকের সহিত মিলিত করিবার জন্য নিরন্তর মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করেন; উহা দূরে পলাইতে প্রয়াস পায়। বহুল প্রযত্নে ও মর্দ্দনে অবশেষে উহা গন্ধক সহ মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে উহার বিষবীর্য্য বিনষ্ট হয়। উহার বর্ণ ও চঞ্চলতা দূরীভূত হয়। এই অবস্থায় উহা রোগীর হিতকর রসায়ন দ্রব্যরূপে পরিণত হয়। মনুষ্যের মনও পারদের ন্যায় চঞ্চল, প্রমাথি ও বলবৎ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন :—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়ুরিব সুদুষ্করম্।"

তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ তু গৃহ্যতে ॥"

অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিলেন :—হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল ও প্রমাথি; বায়ুর ন্যায় মনকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টকর।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন :—

মন যে অত্যন্ত চঞ্চল ও উহা সংযত করা যে অত্যন্ত কষ্টকর, ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মন স্থির করিতে পারা যায়, শুধু ইহাই নহে; মন অসংযত অবস্থায় অতীব অহিতকর। কিন্তু যদি সাধনার প্রযত্নে

উহাকে হরিস্মরণরূপ ব্যাপারে নিযুক্ত করা যায়, তবে এই-রূপে মনঃসংযমের ফল বাস্তবিকই অমৃততুল্য হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় মনের মালিন্য বিনষ্ট হয় এবং উহার চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়। ভগবৎ-স্মরণে ব্যাপৃত থাকিয়া উহা সাধককে পরমানন্দ দান করে।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস হওয়া অতীব সৌভাগ্যের ফল। শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে প্রকট হওয়ার নামই অবতার। তাঁহার অসীম করুণাই ইহার হেতু। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ধর্ম্মের গ্লানি হইলে এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে তিনি অবতীর্ণ হন। সুতরাং জীবের প্রতি কারুণ্যই যে ভগবদবতরণের হেতু, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহা যুগাবতারের হেতু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন ঃ—

> "অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
> রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥
> রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
> এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম॥"

ভূভার-হরণ, অসুর-মারণ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনাদি কার্য্য যুগাবতার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। উহা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে। ধর্ম্মসংস্থাপন দ্বারা জীবের হিতসাধন অর্থাৎ

জীবোদ্ধার করুণার কার্য্য বটে, কিন্তু তাহাতে পরম কারুণ্য প্রকাশিত হয় না। পরম কারুণ্য-প্রকাশ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য, উহা যুগাবতারের কার্য্য নহে; শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ও পরম করুণ, এবং তিনি রসিক-শেখর। ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমরসসঞ্চার করা, নিজে মহাভাব-স্বরূপিণীর নির্ম্মল রসাস্বাদন করা এবং স্বীয় মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাই স্বয়ং ভগবানের অবতরণের হেতু।

অবতার-তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য এ স্থলে এগুলির অবতরণ করা হইল না। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীভগবান্ যখন অবতরণ করেন, তখন এই জগতে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হন। এই শ্রীবিগ্রহই সাধক ও সিদ্ধগণের ভজনাবলম্বন। শ্রীভগবানের প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ সাধকের সর্ব্বদা উপাস্য, অর্চ্চনীয় ও ধ্যানের বিষয়; শ্রীবিগ্রহে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা দুর্ভাগ্য। ইতিপূর্ব্বে সে কথার প্রমাণ শ্রীচরিতামৃত হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ অবতার-বাদে বিশ্বাস করেন না এবং শ্রীবিগ্রহও মানেন না; তাঁহা-দের ধারণায় আমাদের লাভালাভ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিবিধ পুরাণে শ্রীবিগ্রহের উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। সাধারণ লোকের কথায় সাধকের হৃদয়ে সন্দেহ আসিতে পারে; সুতরাং বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা যে অতি প্রয়োজনীয়, ভক্তি-সন্দর্ভে তাহা বিস্তৃতরূপেই আলোচিত হইয়াছে। যাহাকে ভালবাসিতে

চাও, তাহাকে সর্ব্বদাই মনে স্থান দিও, তাহার কথা শ্রবণ করিও, কীর্ত্তন করিও, স্মরণ করিও, মনন করিও, ধ্যান করিও এবং অনুসন্ধান করিও। ধ্যানে ও অনুসন্ধানে অনুরাগ জন্মে। যদি দেখ, আশানুরূপ ফল পাইতেছ না, তাহা হইলে জানিবে, ঠিক্ ঠিক্ কাজ হইতেছে না। কোথাও একটি ত্রুটি আছে, সেই ত্রুটি পরিহার করিয়া ভজন-সাধনে অগ্রসর হইবে। তাঁহার কৃপায় অবশ্য সুফল পাইবে, সন্দেহ করিও না—বিশুদ্ধ ভক্তিতে সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ, মানুষ জ্ঞানের গর্ব্ব ছাড়িতে চায় না। আমরা বড় বেশী বিচার করি। যেখানে বিচার,সেখানে প্রীতির অভাব। "কেন তিলক-মালা ধারণ করিব," "কেন মালা জপ করিব" ইত্যাদি বিচার করিলে শুদ্ধ ভক্তি হইবে না। দাস প্রভুর আজ্ঞা অবিচারে পালন করিবে। তবে ইহাই বিচার্য্য যে, তিলক-ধারণের নিয়ম কি? মালাজপেরই বা নিয়ম কি? ইত্যাদি।

আমাদের ভজন-সাধনের প্রধানতম লক্ষ্য হরিতোষণ; তাঁহার আদেশপালনেই তাঁহার তুষ্টি হয়। যদি মল-মূত্রাদি বিসর্জ্জন ভজনানুকূল্যে করা হয়, তাহা হইলে এগুলিও ভজনের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মগুলিও যদি হরিতোষণার্থ করা হয়, তাহা হইলে তাহারাও ভক্তি বলিয়া গণ্য হয়।

ধর্ম্মসাধন বড়ই কষ্টকর। এই ক্লেশকর ব্যাপার যদি

অকিঞ্চিৎকর অতি নশ্বর ও তুচ্ছ ফলপ্রদ স্বর্গাদির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা বড়ই অযুক্ত হইবে। ধর্ম্মসাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ভক্তিলাভ। ভক্তিসাধন করিলে অন্যান্য সাধন প্রসন্ন হইয়া স্ব স্ব ফল দান করিয়া থাকে। ভক্তি ব্যতিরেকে অন্যান্য সাধন সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও কোন ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সাক্ষাৎ শ্রবণাদিরূপ ভক্তিই আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়। অন্য সাধনাগ্রহে প্রয়োজন নাই। বৈরাগ্যাদির পৃথক্ চেষ্টা না করিয়া শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন কর। পিপীলিকার দল সারি বাঁধিয়া এক খণ্ড গুড়ের দিকে চলিয়াছে। খুব জোরে ফুঁ দাও, উহারা উড়িয়া যাইবে। কিন্তু আবার তাহারা সারি বাঁধিয়া গুড়ের দিকে ছুটিবে। যদি জল ছড়াইয়া দাও, তাহা হইলেও তাহারা সাঁতার দিয়া যাইবে। মারিলেও কোন ফল হইবে না। কিন্তু অন্যদিকে এক টুক্‌রা মিশ্রি ফেলিয়া রাখ, গুড় ছাড়িয়া মিশ্রির নিকটে আসিয়া জুটিবে।

এই প্রকারে বিষয়লুব্ধ মনকে বিষয় হইতে কুড়াইয়া আনিয়া শ্রীভগবৎ-রসাস্বাদনে ব্যাপৃত করিয়া রাখ। আস্বাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত মনের চাঞ্চল্য যাইবে না। আস্বাদ পাইলেই মন উহাতে নিশ্চল ও স্থির হইয়া বসিবে। ভক্তিশাস্ত্র বলেন :—

"কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।"

চৈঃ চরিতামৃত।

এ জন্য যদি বৈদিক নিত্যকর্ম্মাদিও যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য কোনও প্রত্যবায় হইবে না। শাস্ত্র বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ভক্তি-সাধনার জন্য বৈদিক কার্য্যাদির যথারীতি অনুষ্ঠান না করেন, তবে তাঁহার সেই কার্য্য সম্পাদনের জন্য যাট হাজার ঋষি সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত হইয়া প্রতিনিধিরূপে অপেক্ষা করেন। সুতরাং এ নিমিত্ত ভক্তের কোনরূপ প্রত্যব্যয়ের আশঙ্কা নাই। ভক্ত ও ভক্তি-সাধনার এমনই মাহাত্ম্য।

এখন জ্ঞাতব্য এই যে, ভক্তির মাহাত্ম্য ত শুনিলাম, কিন্তু শ্রবণাদিতে রুচি না জন্মিলে, রুচি উৎপাদনের উপায় কি? অজীর্ণতা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে যাহাদের দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, কেবল পুষ্টিকর খাদ্যের মহিমা শুনিয়া তাহাদের কি লাভ হইবে? আহারেই যাহাদের রুচি নাই, সুস্বাদু পুষ্টিজনক খাদ্য তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত করিলে কি হইবে? যাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে, তাহার বিধান করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এ স্থলে ইহাই প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য যে, অরুচি-বিশিষ্ট লোকদিগের শ্রবণাদিতে রুচি উৎপাদনের উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধুসঙ্গ ও মহৎ-সেবাই তাহার উপায়। যদি বল, সাধু কোথায় লাভ হয়? তাহার উত্তর নিম্নলিখিত শ্রীভাগবতীয় প্রমাণ :—

“শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥”

অর্থাৎ পবিত্রতীর্থ-নিষেবণ হেতু মহৎসেবার সুবিধা ঘটে। সেই মহৎসেবার ফলে শ্রদ্ধালু ও শ্রবণেচ্ছু জনের শ্রীভগবৎ-কথায় রুচি হয়। ইহার ফলিতার্থ এই যে, তীর্থে ভাগ্যবশে মহতের সঙ্গ মিলিয়া যায়। মহৎসেবায় শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণের লালসা জন্মে, হৃদয়ে শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হয়, এইরূপে ভগবৎকথায় রুচি জন্মে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান আছেন। এই সকল তীর্থ সাধুগণের সমাগম এবং অধি-ষ্ঠান-ক্ষেত্র। পবিত্রাত্মা ঋষিগণ সর্ব্বদাই তীর্থে তীর্থে পরি-ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিষ্পাপ ও সুপবিত্র হইলেও নিজ দেহমন পবিত্র করিবার জন্যই যেন দীনাতিদীনের ন্যায় তীর্থভ্রমণ ও তীর্থবাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহা-দের আন্তরিক ইচ্ছা লোকশিক্ষা এবং জনসাধারণের কল্যাণসাধন। তাঁহাদের আগমনে তীর্থও তীর্থীভূত হইয়া থাকেন। শ্রীভাগবত বলেন—

"তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।"

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ যাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, এতাদৃশ সাধুগণ তীর্থকে তীর্থ-মহিমায় বিভূষিত করেন। জনসাধারণ তীর্থে গমন করিয়া তীর্থে যে পাপরাশি ক্ষেপণ করেন, সাধু-সমাগমে তীর্থের সেই পাপরাশি দূরীকৃত হয়। সুতরাং তীর্থে তীর্থপাবন সাধুগণের সমাগম এবং তাঁহাদের সেবায় অভক্তের

হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক; অরুচি-বিশিষ্ট জনগণের হৃদয়েও ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মে; তাঁহাদের শ্রীচরণদর্শন, স্পর্শন ও সেবনে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের পরস্পর হরি-কথা-আলোচনা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীভগবৎকথা-শ্রবণে রুচি জন্মে। কপিলদেববাক্যম্—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।"

শ্রীকপিল-দেব বলিয়াছেন, সাধুগণের সহিত সম্মিলন হইলে আমার প্রভাবপ্রকাশক কর্ণের প্রীতিপ্রদ কথার আলোচনা হয়। সেই সুখময়ী কথার নিষেবণে অবিদ্যানিবৃত্তির পথ-স্বরূপ আমাতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তির উদয় হয়। শ্রীভাগবতে রহূগণ নৃপতির প্রতি উপদেশপ্রসঙ্গেও বলা হইয়াছে—

"রহূগণৈতৎ তপসা না যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকম্॥"

অর্থাৎ হে রহূগণ, মহৎপাদরেণুর অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমধর্ম্ম দ্বারা,

সেই সেই কর্ম্মের সেই সেই দেবতার উপাসনা দ্বারা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায় না।

শ্রীচরিতামৃতে ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে, যথা—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু, সংসার না যায় ক্ষয়॥"
"যথোত্তম-শ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষু-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥"

অর্থাৎ মহৎ-সম্মিলনে এই গ্রাম্যকথা-নিবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবাদ হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-কথা-নিষেবণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী মতি সংস্থাপন করিয়া থাকেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণে রুচির উদয় হইলেই বুঝিতে হইবে যে, বৈমুখ্যরূপ ব্যাধির জন্য চিকিৎসা ফল-বতী হইতেছে; ভবব্যাধি উপশমের সম্ভাবনা হইয়াছে।

সাধুগণ বড় কৃপাময়। কোনও গ্রামে এক তেজস্বী সাধু শিষ্য সহ বাস করিতেন। গ্রামের জমীদার বহির্ম্মুখ ছিলেন। জমীদারের কল্যাণ-সাধন করিতে সাধুর ইচ্ছা হইল।

এক দিন তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে ভিক্ষার্থী হইয়া জমীদারের বাড়ীতে যাইতে বলিলেন। প্রথম দিন জমীদার তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। শিষ্যগণ ভীত হইয়া গুরুর নিকট আসিয়া জমীদারের দুর্ব্যবহারের কথা নিবেদন করিলেন। গুরুদেব ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া পরদিন আবার তাঁহাদিগকে উক্ত জমীদারের বাটীতে পাঠাইলেন। এবার জমীদার সেরূপ তাড়া করিলেন না, কিন্তু ভিক্ষা দিলেন না। তৃতীয় দিন গুরুদেবের আদেশে উঁহারা জমীদারের গৃহিণীর নিকটে ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী এক টুক্‌রা ন্যাকড়া ফেলিয়া দিলেন। সাধুর আদেশে শিষ্যগণ উহা ধৌত করিয়া শুষ্ক করিলেন। অতঃপর উহা দ্বারা সলিতা প্রস্তুত করিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখস্থ দীপে দেওয়া হইল। সেই দীপ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের আরতি করা হইল। পরদিন গুরুদেবের আদেশে শিষ্যগণ আবার যাইয়া দেখিলেন, জমীদারের ভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে দিন তিনি কিছু চাউল দান করিলেন। সাধু, স্থানীয় ভক্তগণকে আশ্রমে আনাইয়া উক্ত তণ্ডুলের দ্বারা প্রস্তুত শ্রীবিগ্রহের প্রসাদান্ন ভোজন করাইলেন। এইরূপে সাধুর কৃপায় জমীদারের হৃদয় এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল যে, তিনি সাধুদর্শনার্থ তাঁহার আশ্রমে আসিলেন ও তাঁহার পাদস্পর্শে জমীদারের হৃদয়ে সহসা ভক্তির উদয় হইল ও সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। তিনি সাধুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার

সকল সম্পত্তি দেব-সেবার জন্য অর্পণ করিয়া নিজে নিষ্কিঞ্চন সর্ব্বস্বত্যাগী বৈষ্ণব হইলেন।

সাধুর কৃপা মহাশক্তিশালিনী, এই কৃপা অনায়াসলভ্যা। সাধুসঙ্গলাভ করিতে হইলে তীর্থে গমন করিতে হয়। তীর্থে অনেক মহাপুরুষ লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করেন। সামান্য প্রয়াসে তাঁহাদের দর্শনলাভ হয়। দেহ, গেহ আদি আমাদের ভজন-সাধনের বাদী। সাধুসঙ্গের পক্ষেও ইহারা কণ্টকস্বরূপ। দেহাদির প্রতি মমতাবশতঃ আমরা দূরে যাইয়া সাধুসঙ্গ করিবার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে পারি না। এত বাদীর ভিতরে থাকিয়াও আমাদিগকে লুকাইয়া লুকাইয়া প্রেম করিতে হইবে।

সাধুমুখে যে ভাগ্যবান্ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মদান করেন। সাধুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি। তিনি যখন কৃষ্ণকথা বলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ কথারূপে শ্রবণ-কারীর কর্ণের ভিতর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করেন এবং হৃদয়ের আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করতঃ উহা নির্ম্মল করিয়া সেখানে তিনি সুখে বিশ্রাম করেন।

দুর্ব্বাসনা-ত্যাগের আমাদের সামর্থ্যও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। তবে উপায় কি? উপায়—সাধুমুখে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিলেই সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার-বিনাশের মত হৃদয়ের বাসনারাশি দূরীভূত হইবে। এই উপায়ে বাসনা-ত্যাগই সুখসাধ্য।

ভাগবতসেবাতে অশুভরাশি বিনষ্টপ্রায় হইলে শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী রতির আবির্ভাব হয়। দুর্ব্বাসনার সম্যক্ নিবৃত্তি না হইলে জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের আবির্ভাব হয় না। কিন্তু ভক্তির বিশিষ্টতা এই যে, ইনি নিরর্গলস্বভাবা। সর্ব্বত্রই তাঁহার অবাধ ও স্বচ্ছন্দগতি। যে চিত্তের বাসনা-মল সম্যক্ ধৌত হয় নাই, সেই চিত্তেও নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

জ্ঞান বলেন,—"যাহার গৃহে দুর্ব্বাসনা চণ্ডালিনী আছে, তাহার ঘরে যাইয়া আমি জাতি হারাইব না।" ভক্তি তেজস্বিনী, তিনি জাতি হারাইবার ভয় রাখেন না। তিনি বলেন,—"থাক্ না দুর্ব্বাসনা, আমি উহা শোধন করিয়া লইব। বিষয়-বাসনাকে আমি শ্রীকৃষ্ণ-বাসনায় পরিণত করিব।" বাসনা নিজে অপবিত্র নয়। বিষয়ভেদে উহা পবিত্র ও অপবিত্র হইয়া থাকে।

একটি ছোট ছেলে একটি মাটীর ডেলা মুখের ভিতর পূরিল। সকলের নিবারণ সত্বেও সে উহা চিবাইতে লাগিল, কিছুতেই ফেলিল না। জোর করিয়া ফেলিয়া দিতে যাওয়ায় সে কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে উহার মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ছেলের মুখে একটি রসগোল্লা দিলেন। রসগোল্লার স্বাদ পাইয়া সে অমনি মাটী ফেলিয়া দিয়া রসগোল্লা খাইতে লাগিল।

জ্ঞানে ও ভক্তিতে ইহাই পার্থক্য। জ্ঞান জোর করিয়া

বিষয়-বাসনা ছাড়াইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্তি তাহা করেন না। তিনি অপ্রাকৃত মধুর রসাস্বাদন করাইয়া বিষয়-বাসনা ত্যাগ করান। ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীধ্রুব মহাশয়। উঁহার মনে ছিল, রাজা হইব। পরে যখন শ্রীভগবান্ দর্শনদান করিয়া বর দিতে চাহিলেন, তখন তিনি বলিলেন—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

"প্রভো, আমি কি বর চাহিব, রাজ্যলাভাশায় তপস্যা করিতে করিতে আমি দেব-মুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। আমি কাচ খুঁজিতে যাইয়া দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আর কোন বর চাই না।"

পূর্ব্বোক্ত ভাগবতসেবা অর্থে ভক্ত বা ভাগবতশাস্ত্র-সেবা। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা দ্বিবিধা ঃ—

১। তুলসী-চন্দন-গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ; এবং

২। অধ্যয়ন দ্বারা সেবা।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপযুক্ত বক্তা পাইলে শ্রোতা হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা নিজে বক্তা হইয়া ভক্তগণকে আস্বাদন করান উচিত।

অভিমান থাকিলে আস্বাদন হইবে না। পাঠকের মনে যেন কোনও প্রকার অভিমান না আসে। পাঠক দীনতার সহিত শ্রোতৃবর্গকে বলিবেন—আমি অযোগ্য। আমার পঠন যেন শুকের পঠন। আপনাদের শুভাগমনে, আপনাদের শ্রবণবাঞ্ছার ঐকান্তিকতায় শ্রীভগবান্ প্রীত হইয়া আপনাদের প্রীতির জন্য আমার হৃদয়ে ও রসনায় শক্তি-সঞ্চার করুন, তাঁহার কৃপায় এবং আপনাদের সেবাভিলাষী হইয়া আমি যেন পাঠ করিতে পারি, তাঁহার শ্রীচরণে ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

এইরূপে শ্রীভাগবতসেবা করা কর্ত্তব্য। বক্তা বা শ্রোতার অভাবে নিজে নিজে ভক্তিসহকারে ভাগবত পাঠ করা উচিত। ভক্তিই ভাগবতের আত্মা। ভক্তিতেই শ্রীভাগবতের অর্থ প্রকাশিত হয়। ভক্তগণের সিদ্ধান্ত এই যে, "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" অর্থাৎ কেবল ভক্তি দ্বারাই শ্রীভাগবতের অর্থ পাঠকের ও শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রত্যহ শ্রীভাগবত অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অন্ততঃ দুই একটি শ্লোকেরও রসাস্বাদন করিতে হইবে। যত প্রকার সাধুসঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শাস্ত্রসঙ্গই শ্রেষ্ঠতম। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥

এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥”

এ স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মহামহিমা শ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত পদটি এখানে প্রধানতম ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়াই সাধুসঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই শ্রীমদ্‌ভাগবত উপলক্ষ করিয়াই তদনুগত ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রমাত্রই ভাগবতশব্দের তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। ইহার অনুশীলনে বিষয়-কথা আসিতে পারে না। কেবলমাত্র শ্রবণের এই অপূর্ব্ব ফল। শ্রীমদ্ভাগবতের এমনি শক্তি যে,

“সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।”

অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণমাত্রেই সুকৃতী শ্রবণেচ্ছু জনগণের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ অবরুদ্ধ হ’ন। সুতরাং ভক্তিসহকারে নিত্যই শ্রীভাগবতসেবা করা কর্ত্তব্য। যদিও বস্তুশক্তিবলে কেবল শ্রবণমাত্রেই আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, তথাপি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মনন ও উপদেশবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মনন ও অনুষ্ঠানের নিতান্ত প্রয়োজন।

দ্বিবিধ ভাগবতের সেবা দ্বারা ভগবানের অনুধ্যানরূপা ভক্তির আবির্ভাব হয়। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় নিরন্তর হরিধ্যান অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ইহাই নৈষ্ঠিকী ভক্তি।

শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভাগবত-ধর্ম্মনির্ণয়ে কথিত হইয়াছে :—

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ-পদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥"

৫৩।২।১১শ স্কন্ধঃ।

নিমেষার্দ্ধকাল-মাত্র হরিস্মৃতি পরিহার করিলে যদি ত্রিভুবনের রাজত্বও করতলগত হয়, তথাপি সেই ক্ষণার্দ্ধ-মাত্র সময়ও বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণের অন্বেষণীয় শ্রীভগবৎ-পদারবিন্দ-ভজন হইতে যে ভক্তের চিত্ত বিচলিত হয় না, তিনিই বৈষ্ণব-প্রধান।

ইহার ফলিতার্থ এই যে, যদি কেহ বলেন,—"হে সাধক-প্রবর! তুমি যদি ক্ষণার্দ্ধমাত্র সময়ও শ্রীহরিচরণ-স্মরণ হইতে তোমার চিত্তকে তুলিয়া লইতে পার, তাহা হইলে এখনই ত্রিভুবনের রাজত্ব তোমার করতলগত করিয়া দিতে পারি।" নৈষ্ঠিকভক্ত তদুত্তরে বলেন,—"তোমার দেয় ত্রিভুবনরাজত্ব আমার নিকট এত তুচ্ছ যে, উহার জন্য নিমেষার্দ্ধকালও

আমি শ্রীহরিচরণ বা শ্রীহরিপাদপদ্ম-ভজন হইতে বিচলিত হইতে পারি না।" বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণও নিরন্তর সেই পাদপদ্ম-ভজনের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ভজনানন্দ তাঁহাদেরও দুর্ল্লভ। ত্রিভুবনের রাজত্বকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া এক নিমেষার্দ্ধ সময়ের জন্যও যিনি শ্রীভগবৎচরণ হইতে বিচলিত হন না অর্থাৎ সেই শ্রীচরণ সদাই যাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে, সেই ভক্তকেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

বিষয়-বাসনাই আমাদিগকে ভক্তি হইতে বিচলিত করে।

ভক্তির বিঘ্ন পাঁচ প্রকার। যথা—লয়, বিক্ষেপ, কষায়, রসাস্বাদ ও অপ্রতিপত্তি।

১। লয়—কীর্ত্তনাদিতে নিদ্রার উদ্গম। কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণে অধিক, শ্রবণ অপেক্ষা স্মরণে আরও অধিক। লয়ের হেতু—তমঃপ্রাধান্য। সত্ত্বগুণের উদয়ে তমোভাব তিরোহিত হয়।

২। বিক্ষেপ—অর্থাৎ বিপরীত দিকে ক্ষেপণ; অবিদ্যা চিত্তকে বিপরীতদিকে ক্ষেপণ করিলে চিত্তের সেই অবস্থা বিক্ষেপ নামে কথিত হয়। ভগবান্ হইতে চিত্তের অন্যত্র বিচলন অর্থাৎ দেহ-গেহাদির অভিমুখে চিত্তের গতি হইলে তাহাকে বিক্ষেপ বলা যায়। রজোগুণই ইহার হেতু; সত্ত্বগুণ ইহার বিনাশক।

৩। কষায়—বিবিধ বিষয়-বাসনারই নামান্তর। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—কাম-ক্রোধাদি, রজোগুণ হইতেই উদ্ভূত হয়। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বাসনা-সংস্কার সত্ত্বগুণের উদ্রেক ব্যতীত নিরস্ত হয় না।

৪। রসাস্বাদ—বৈষয়িক সুখসম্ভোগলালসা। জীবের চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা নিরন্তর বিষয় আহরণ ও সম্ভোগ করে। গীতাশাস্ত্রে এই রসাস্বাদের উল্লেখ আছে, উহার নিবারণের উপায়ও শ্রীভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জ্যং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

দেহী যখন বিষয় আহরণ পরিহার করিতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই তাঁহার বিষয়সুখ-ভোগলালসা বিনিবৃত্ত হইতে থাকে। কিন্তু তথাপি তাঁহার লালসা-সংস্কার থাকিয়া যায়। শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়।

৫। অপ্রতিপত্তি—চিত্তের অবসাদ অবস্থা। এই অবস্থায় কিছুই ভাল লাগে না। সকল বিষয়েই চিত্তের ঔদাস্য অনুভূত হয়।

ভক্তিযোগের আরও বহুল বিঘ্ন আছে। সাধকের পক্ষে প্রতিপদেই বিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয়। কিন্তু অব্যভিচারিণী নৈষ্ঠিকী ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবৎ-কৃপায় কোনও বিঘ্ন

ভগবদ্ভক্তকে অভিভূত করিতে পারে না। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বিঘ্নের পর বিঘ্ন আসিলেও ভক্ত তাহাতে অভিভূত হন না। তাঁহার হৃদয়ে ভগবচ্চরণারবিন্দ-ধ্যান ব্যতীত অন্য বিষয় প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার পূর্ব্বাবস্থা সগুণা ভক্তি, পরের অবস্থা নির্গুণা ভক্তি। নৈষ্ঠিকী ভক্তির অবস্থায় চিত্ত ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে। বিঘ্ন সকল নীচে পড়িয়া থাকে। উহা নৈষ্ঠিক ভক্তকে স্পর্শও করিতে পারে না। বিঘ্নাদি দৈহিক উপদ্রব দেহে উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের চিত্ত ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকে।

এই প্রকারে চিত্ত রজস্তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রসন্ন-সলিল হ্রদের ন্যায় সুস্থ, শান্ত ও সুপ্রসন্ন হয়। কেন না, নৈষ্ঠিকী ভক্তির প্রভাবে চিত্তক্ষেত্র ভগবানেব অধিষ্ঠানক্ষেত্রে পরিণত হয়। জন্মজন্মান্তরের বাসনাসংস্কার তিরোহিত হইলেই চিত্ত ভক্তির লীলাভূমি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কেবল ভগবৎ-সঙ্গ ব্যতীত জগতের নিখিল সঙ্গ হইতে ভক্তচিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া ভজনানন্দের সুধাস্বাদসম্ভোগে কৃতার্থ হয়। পরাভক্তির বিন্দুমাত্র প্রাপ্ত হইলেও দেহগেহের সুখসম্ভোগ-লালসা দূরীভূত হয়। শ্রীভরত মহারাজ প্রভৃতি মহাত্মগণ এইরূপ ভক্তি-লাভেই বিপুল রাজ্যসুখভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিষয়বাসনার সংস্কার এমনই প্রভাবশীল যে,

শ্রীভরত মহারাজের হৃদয়ে মৃগশাবকের প্রতি মমত্ববোধ দূরীভূত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত নিগু´ণা ভক্তির প্রভাবে একমাত্র ভগবদ্-বিষয় ব্যতীত চিত্তে অন্য কোনও বিষয় স্থান পায় না। তখন নিরন্তর চিত্তে শ্রীভগবৎ-স্ফূরণ হইতে থাকে। তাঁহারই রূপগুণ-লীলাতরঙ্গে সাধকের হৃদয় দিবানিশি পরিষিক্ত থাকে। এই অবস্থার নাম ভগবৎ-অনুভব বা ভগবৎ-রসাস্বাদন। তখন শ্রীভগবান্ সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। ইহারই অপর নাম ভগবৎসাক্ষাৎকার। ইহা স্বতঃফলস্বরূপ ও নিত্যানন্দস্বরূপ। ইহার অপর কোন ফল নাই। সুখরূপ ফলের জন্যই আমরা সকল কার্য্য করিয়া থাকি। সকল সাধনার ফলই আনন্দ। শ্রীভগবান্ই মূর্ত্ত পরমানন্দ। সুতরাং তদ্দর্শনই তদ্দর্শনের ফল। শাস্ত্রে ইহার আনুষঙ্গিক ফলও কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

> "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

অর্থাৎ তাঁহার দর্শনে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সংশয়সমূহের নিবৃত্তি হয় এবং কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীভগবৎ-দর্শনে সর্ব্বপ্রকার সংশয় দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা কৃত, ক্রিয়মাণ, করিষ্যমাণ, প্রারব্ধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া যায়।

যত দিন শ্রীহরি হৃদয়ে যাতায়াত করেন, অর্থাৎ স্থিরভাবে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত না হন, তত দিনই সাধকের এ সংসারে যাওয়া-আসা। তিনি নিশ্চলভাবে হৃদয়ে অবস্থান করিলে যাওয়া-আসারও চির-বিরাম হইবে। ইহাই মুক্তির পরাবস্থা। সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ পরমানন্দস্বরূপ বাসুদেবে আত্মশোধিনী ভক্তি করেন। ভক্তি ব্যতীত চিত্তশোধনের বহুবিধ উপায় থাকিলেও সেগুলি ভক্তির ন্যায় কার্য্যকারী নহে। ভক্তি আনন্দময়ী। সাধনকালে ও সাধ্যকালে ভক্তির অনুষ্ঠান পরম সুখময়। কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহকালেও ক্লেশ, পরকালেও ক্লেশ। কিন্তু ভক্ত কখনও ক্লেশ পান না।

ভক্তির অনুষ্ঠান হইলে স্বতঃই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই জন্য পৃথক্ প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। কেবল ভক্তির সাধনই জীবের প্রধানতম কর্ত্তব্য।

অন্য দেবতা-ভজনও কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া পরিত্যজ্য। রজোগুণাভিমানী ব্রহ্মা ও তমোগুণাভিমানী শিবের উপাসনায় শ্রেয়োলাভ হয় না। সত্ত্বতনু বিষ্ণুর আরাধনাতেই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

কাষ্ঠ হইতে ধূম এবং ধূম হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। কাষ্ঠস্থানীয় শিব, ধূমস্থানীয় ব্রহ্মা এবং অগ্নিস্থানীয় বিষ্ণু। যেমন কাষ্ঠ বা ধূমে ঘৃত অর্পণ করিলে যজ্ঞ সফল হয় না,

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারাই যজ্ঞ সফল হয়, তেমনই শিব ও ব্রহ্মার উপাসনা না করিয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিলেই মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

এখানে বিবেচনীয় বিষয় আছে। জীবকোটি ও ঈশ-কোটিভেদে ব্রহ্মা ও শিব দ্বিবিধ। কল্পবিশেষে কোনও শ্রেষ্ঠতম জীব ব্রহ্মত্ব বা শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি বা লয় করিয়া থাকেন। এই জীবকোটি ব্রহ্মা বা শিবের উপাসনাই নিষিদ্ধ, কারণ, ইঁহারা যথাক্রমে রজোগুণাভিমানী ও তমোগুণাভিমানী।

এতদ্ব্যতীত ঈশকোটি ব্রহ্মা ও শিবের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত আছে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে তুরীয় শিবের তত্ত্ব বর্ণিত আছে। তুরীয় অর্থে চতুর্থ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন উপাধিরহিত। ইনি ত্রিগুণময়ী মায়ার অতীত। তুরীয় শিব মুক্তি দিতে সমর্থ, এমন কি, তিনি জীবহৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি সঞ্চার করিতেও পারেন। এই সকল তত্ত্ব না জানাই যত বিবাদের কারণ।

শিবের দ্বিবিধ ভাব—ভগবদ্ভাব ও ভক্তভাব। শৈবগণ ভগবদ্ভাবেই তাঁহার উপাসনা করেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার ভক্তভাব গ্রহণ করেন এবং সেই ভাবেই তাঁহার সমাদর করেন। ভক্তভাব নিকৃষ্ট নয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করেন। শ্রীগৌরাবতারে তাঁহার ত্রিবিধ ভাব দৃষ্ট হয়, যথা—শ্রীমুরারি গুপ্তমহাশয়ের কড়চায়—

"গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ"। অর্থাৎ এই লীলায় কখন তাঁহার গোপীভাব, কখন বা দাসভাব (ভক্তভাব), আবার কখন ভগবদ্ভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং শিবের ভক্তভাবও হেয় নহে।

ভৈরবাদি দেবগণের পূজকগণ সকাম। কিন্তু এই দেবগণ মুক্তি দিতে পারেন না। সুতরাং মুমুক্ষুগণ শ্রীনারায়ণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। অন্য দেবগণের নিষ্ঠাময়ী উপাসনা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পক্ষে বৈধ না হইলেও তাঁহাদের অনাদর করা অপরাধজনক। এই দেবতারা শ্রীহরির নিজ-জন, এই মনে করিয়া ইঁহাদের আদর করাই কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে শ্রীহরি অপ্রসন্ন হন।

যদি বাসনা-পূরণের জন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহা হইলেও তাঁহার বাসনা অপূর্ণ থাকে না। যেহেতু, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। বিবিধ বরদাতা দেবগণ তাঁহারই আজ্ঞাধীন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার শ্রীচরণ-দাসী। যাহাদের হৃদয়ে ভোগবাসনা আছে, তাহারা ভূত-প্রেত এবং পিতৃগণের ও অপরাপর দেবতার সেবা করেন। কিন্তু জীবের চরম কল্যাণ এই সকল উপাস্যের উপাসনায় সিদ্ধ হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, শ্রীবাসুদেবের ভজনই সর্ব্বভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; সকল শাস্ত্রেরই ইহাই মুখ্য উপদেশ। নিখিল বেদ শ্রীবাসুদেবকেই প্রতিপাদন করেন। শ্রুতি বলেন:—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলেন :—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"

বেদে যে যজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীবাসুদেবই তাহার তাৎপর্য্য। কারণ, যজ্ঞ দ্বারা শ্রীবাসুদেবেরই আরাধনা হইয়া থাকে।

যমনিয়মাদি-যোগাঙ্গেরও শ্রীবাসুদেবারাধনাই তাৎপর্য্য। যোগের সাহায্যে চিত্ত স্থির হইলে, শ্রীবাসুদেবই সেই চিত্তের অধিষ্ঠাতৃরূপে স্ফুরিত হয়েন। যে জ্ঞান দ্বারা শ্রীবাসুদেবকে জানা যায় না, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, উহা অজ্ঞান। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিতেছেন,—

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ সুকৃতী ব্যক্তি আমাকে ভজন করেন।

জ্ঞানীর মধ্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষা সবিশেষ বাসুদেবজ্ঞানী শ্রেষ্ঠতর। বাসুদেবতত্ত্বজ্ঞানীই যথার্থ জ্ঞানী, তাই শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

এক শ্রেণীর লোক সুখভোগের জন্য স্বর্গে যাইতে চায়। কিন্তু ইহারা প্রকৃত সুখের বিচার করে না, বা তাহার

অনুসন্ধানও করে না। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-ভজন ভিন্ন আর কোথাও যে প্রকৃত সুখ নাই, তাহা ইহারা বুঝিতে চেষ্টা করে না। স্বর্গের বাজারে আসিয়া গিল্‌টি মালের চটক দেখিয়া তাহাই ক্রয় করে, দুদিন পরে সে চটক চলিয়া যায়, সোনার দরে পিতল ক্রয় করিয়াছে বলিয়া অবশেষে হাহাকার করে।

পার্থিব ভোগবিলাস, স্বর্গসুখ, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রকৃত আনন্দজনক নহে; কেবল একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই নিত্যানন্দস্বরূপ। স্বর্গেও নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাস নাই; তাহা থাকিলে সুরেশ্বর ইন্দ্রকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত না। দৈত্যেরা যখন স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে, দেবতা-দিগকে তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হয়। স্বর্গের কোন কোন ইন্দ্রের কামকলুষিতার কথা শুনিলে এই পৃথিবীর অতি সাধারণ সাধুকেও অবাক্ হইতে হয়। কোন কোন ইন্দ্রের পরশ্রীকাতরতা এত অধিক ছিল যে, পৃথিবীর কোন লোককে কিঞ্চিৎ তপস্যা করিতে দেখিলেই তাঁহাদের মনে আশঙ্কা হইত, পাছে তপস্যার বলে এই ব্যক্তি ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হয়; এই জন্য উহার তপোবিঘ্ন উৎপাদনের নিমিত্ত ইন্দ্র বারাঙ্গনা প্রেরণ করিতেন। সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু বিবিধ দুঃখ-বিমিশ্র এতাদৃশ স্বর্গ কোন বুদ্ধিমান্ লোকের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আনন্দতত্ত্বপরিজ্ঞানের জন্য সাধু শাস্ত্র অবশ্য আলোচনীয়। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় উপদেশ করিয়াছেন,—

"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ"

অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতি সম্বন্ধে শাস্ত্রই প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে,—

"মায়াবদ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদপুরাণ॥"

ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বনির্ণয়ে শাস্ত্রই আলোকবর্ত্তিকা। এক ব্যক্তি জন্মাবধি সূর্য্যালোক দেখে নাই। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি গবাক্ষদ্বারে একটু একটু সূর্য্যালোক দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন,—"এই সূর্য্য।" পরে ক্রমশঃ সূর্য্য-মণ্ডল দেখাইলেন, তার পরে বলিলেন,—"এই মণ্ডলমধ্যে সপ্তাশ্বযুক্ত রথে সূর্য্যদেব বর্ত্তমান আছেন।"

তেমনই আমরা মায়ার ঘোর অন্ধকারে রহিয়াছি। চৈতন্যতত্ত্ব জানি না। পরম কারুণিক শাস্ত্র একটু একটু করিয়া আমাদিগকে পরতত্ত্বে লইয়া যাইতেছেন। প্রথমতঃ শাস্ত্র বলেন,—পিতামাতা ঈশ্বর; পরে বলিতেছেন—ইন্দ্রাদি দেবগণই ঈশ্বর; অবশেষে বলিতেছেন,—শ্রীবাসুদেবই ঈশ্বর এবং ইনিই জীবের একমাত্র উপাস্য।

চৈতন্যভাস্কর শ্রীবাসুদেবতত্ত্ব বুঝানই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহসা জীবের পক্ষে বাসুদেবতত্ত্ব ধারণা করা অসম্ভব। এই নিমিত্ত শাস্ত্র ধীরে ধীরে সাধককে বাসুদেবতত্ত্বে উপস্থাপিত

করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম—বসুদেব। বসতি অস্মিন্ ইতি বসু। অর্থাৎ যাহাতে বাস করা যায়, তাহাই বসু। বিশুদ্ধ-সত্ত্বই বসুদেব। ইহাই হরির বাসস্থান। এই বিশুদ্ধসত্ত্বে বাস করার জন্য তাঁহার এক নাম বাসুদেব। ব্রহ্মের দুই প্রকার অভিব্যক্তি ;—নিরাকার ও সাকার অর্থাৎ অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত। নিরাকারের আশ্রয় সাকার। আশ্রয় ব্যতীত জ্যোতিঃ-পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। শ্রীভগবান্ মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহাতে তিনি বিকারী হয়েন না। শ্রীভগবান্ সৃষ্টিকার্য্য করিয়াও নির্ব্বিকার। তিনি এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। সৃষ্টি করিয়া যে স্রষ্টা সৃষ্টবস্তু হইতে পৃথক্ থাকে, তাহাকে সেই সৃষ্ট বস্তুর নিমিত্ত-কারণ কহে। যেমন ঘটের নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার। যে কারণ সৃষ্ট বস্তুর সহিত একত্র থাকে, তাহাকে উপাদান-কারণ বলা হয়। যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা। উপাদান-কারণ বিকার-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রীভগবান্ জগদ্রূপে পরিণমিত হইয়াও অচিন্ত্য শক্তিবলে স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। দৃষ্টান্ত এই যে, স্যমন্তকমণি প্রত্যহ অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত বস্তুরই যখন এরূপ অচিন্ত্য শক্তি দৃষ্ট হয়, তখন শ্রীভগবানে যে ঐ প্রকার অচিন্ত্য শক্তি থাকিবে, ইহাতে আর বিস্ময় কি ?

এই তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতের পয়ারগুলি অতি

পরিস্ফুট। কিন্তু শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই বিশ্ব-প্রসবিনী। বিশ্বের ভিতরে যে বিশ্বেশ্বরের দর্শন হয়, অথবা জীবের অন্তর্য্যামিরূপে যে পরমাত্মার অনুভব হয়, এই দুই তত্ত্বই মায়াসংস্পৃষ্ট। এই তত্ত্ব বৈষ্ণবের উপাস্য নয়। শক্তি-বর্গের ও তাহাদের ধর্ম্মাতিরিক্ত চিদেকরস ব্রহ্মও বৈষ্ণবের উপাস্য নহেন। বৈষ্ণবের উপাস্য,—সবিশেষ ব্রহ্ম নারায়ণ এই শ্রীনারায়ণও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য নহেন। ইনি যাঁহার বিলাসস্বরূপ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌর-গোবিন্দ-সুন্দরই আমাদের উপাস্য। ইহাই উপাস্য তত্ত্ব। বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির দ্বারাই এই পরমতত্ত্বের উপাসনা হয়। এই প্রেম-ভক্তিই উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী ভক্তি। এই উপা-সনাই শ্রীব্রজবধূগণের প্রকল্পিতা। তাই সিদ্ধভক্ত লিখি-য়াছেন,—

"রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।"

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বৈধী ভক্তির আলোচনা দৃষ্ট হয়; শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিবরণ আছে, শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে প্রচুরপরিমাণে এই কয়েক প্রকার ভক্তির সুবিচার করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থেই শ্রীব্রজদেবীগণের সেবাসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যবর্ণনার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। প্রীতি-সন্দর্ভে উহারই

সূক্ষ্মবিচার আছে, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সকল শ্রীগ্রন্থ পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্বন্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ ও শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ পঠনীয় ও সবিশেষ আলোচ্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই সকল তত্ত্বের অতি সংক্ষিপ্তসার দিগ্‌দর্শনলেশাভাস মাত্র প্রকাশিত হইল।

ভক্তিসম্বন্ধীয় কতিপয় সিদ্ধান্ত নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

১। শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের কারণ

শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর অতি সুস্বাদু গলিত ফল। এই শ্রীগ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং সর্ব্ববেদান্তসার। এই সকল উক্তির প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় শ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভের প্রারম্ভে এ সম্বন্ধে সুবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। এ স্থলে কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের কারণমাত্র বলা হইতেছে। একদা শ্রীবেদব্যাসের আলয়ে শ্রীমৎ নারদঋষি আগমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীমদ্‌ব্যাসদেব বিষণ্ণ অবস্থায় আছেন। পরম কারুণিক সর্ব্বজ্ঞ ঋষি শ্রীমদ্‌ব্যাসদেবের বিষাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—“আপনার চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ এই যে, আপনি ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে বহুল গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের মহিমা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সবিশেষ আলোচনা পূর্ব্বক কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ভক্তি ব্যতীত আত্মা

প্রসন্নতা লাভ করেন না। শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনেই বাক্যের সাফল্য হয়। নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞানাদি ভক্তি ব্যতীত শোভা পায় না। আপনি সত্যব্রত, যথার্থদর্শী ও বিশুদ্ধ যশস্বী; আপনি সমাধিসহযোগে শ্রীভগবানের লীলাদির অনুস্মরণ করুন। শ্রীহরির লীলা-বর্ণনা ব্যতীত মহাভারতাদি গ্রন্থে এবং অন্যত্র আপনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত ও অন্যায়ই হইয়াছে। কাম্যকর্ম্মাদি-বর্ণনের পরিবর্ত্তে শ্রীহরি-লীলাবর্ণনা করুন; কাম্যকর্ম্মাদিতে লোকের প্রকৃতি প্রেরণ না করিয়া তৎপরিহার পূর্ব্বক পৃথক্ ভগবদ্‌ভক্তির অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়াই আপনার উচিত ছিল। এইরূপ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন না করাতে আপনি চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই।"

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভজন করিতে করিতে যদি মানুষের পতন বা মরণ হয়, তাহা হইলেও সাধকের অকল্যাণ হইবে না। ভক্তিদেবী এক দিন সাধককে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে লইয়া যাইবেন। কর্ম্মত্যাগের ফলে সাধক যদি নিন্দিত কোনও যোনি প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সাধকের কোন ক্ষতি হইবে না। শ্রীমৎ দেবর্ষি নারদ শ্রীমদ্‌ব্যাসদেবকে শ্রীভগবল্লীলা-মাহাত্ম্য এবং কর্ম্মজ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীভগবল্লীলাময়ী ও শ্রীভগবদ্ভক্তিময়ী আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত উহারই অমৃতময় ফল।

২। ভক্তির মূল্য।

যেমন সোনার মূল্য পাত্র বা ব্যক্তিবিশেষে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তেমনই ভক্তিরূপ স্বর্ণ-মোহর ব্রাহ্মণের হাতেই থাকুন বা চণ্ডালের হাতেই থাকুন, ইহার মূল্য সর্ব্বত্রই সমান। ভক্ত যেখানেই যখন যান না কেন, তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। ভক্তের নিকট স্বর্গ-নরক, সুখ-দুঃখ সকলই সমান।

৩। অধিকার-বিচার।

শ্রীভগবান্ শ্রীমৎ উদ্ধবের প্রতি এই উপদেশ করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোপদেশে যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না জন্মিবে অথবা হরি-কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মিবে, তাবৎ কর্ম্ম করিতে হইবে। এই প্রকার অধিকার যাঁহার হয় নাই, তিনিও যদি কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন করেন, তাঁহার তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। ভজনের অপক্কাবস্থায় যদি তাঁহার দেহপাত হয় বা তিনি যদি ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলেও তাঁহার কোনও প্রত্যবায় হইবে না। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উপদেশ দিয়াছেন :—

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি।"

কল্যাণকারী কোন প্রকার দুর্গতিতে পতিত হন না। ভক্তি করিলে সকল দোষ খণ্ডন হয়। ভক্তি না করিলে গুণও দোষে পর্য্যবসিত হয়। যত দিন পর্য্যন্ত জীবের

শ্রীহরিসাক্ষাৎকার না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত জীবের অনেক শ্রোতব্য ও কর্ত্তব্য থাকে। চিত্ত যখন শ্রীভগবদুন্মুখ হয়, তখন শ্রীহরিই একমাত্র শ্রোতব্য ও কীর্ত্তিতব্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

৪। শ্রীভগবানের ভজনীয় গুণ

(ক) শ্রীভগবান্ সর্ব্বাত্মা, তাই তিনি প্রিয়তম। জীবাত্মা আমাদের প্রিয় বটে, কিন্তু শ্রীভগবান্ জীবাত্মারও আত্মা। তিনি ভগবান্ অর্থাৎ সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধু-র্য্যাদির আশ্রয়। তিনি হরি অর্থাৎ জীবগণের অশেষ দুঃখ, এমন কি, ভববন্ধন পর্য্যন্ত হরণ করেন। তিনি পরম দয়াল। তিনি বলেন, তোমরা কেবল আমার কথা বলিবে, আমার নাম করিবে, আমাকে স্মরণ করিবে, তাহা হইলে আমি তোমাদের সকল কার্য্য সমাধান করিব। শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হয়। আনন্দ-নিধি শ্রীহরিতে নিরন্তর মন রাখা কর্ত্তব্য, অন্য বিষয়ে যেন আবেশ না হয়, বহুতে চিত্তবৃত্তি রাখিলে চলিবে না, একমাত্র শ্রীভগবানেই মন ডুবাইয়া রাখিতে হইবে।

(খ) তিনি ভাবগ্রাহী, তিনি সাধকের হৃদয় বুঝেন। যাকে তুমি ভালবাস, সে যদি তোমার হৃদয় না বুঝে, তাহা হইলে বড় দুঃখ। সংসারে কেহ কাহারও হৃদয়ের কথা বুঝে না, কাজেই সংসারে ভালবাসার পাত্র কেহই নাই। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র ভালবাসার পাত্র।

(গ) তিনি অন্তর্য্যামী, তাঁহাকে প্রীত করিলে সকল-কেই প্রীতি করা হয়, যদি বিশ্ব-প্রেমিক হইতে চাও, তাহা হইলে শ্রীহরিকে ভজনা কর।

(ঘ) তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ অসম্ভব।

(ঙ) তাঁহাকে যিনি প্রীতি করেন, তিনিও তাঁহার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকেন। সেই প্রকার শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

অর্থাৎ যাঁহারা আমাকে যেরূপ ভাবে ভজন করেন, আমিও তাঁহাদিগকে সেইরূপ ভাবে ভজন করিয়া থাকি।

৫। তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ;" ইহার অর্থ এই যে, তিনি সবই করিতে, না করিতে ও অন্যথা করিতে পারেন।

৬। তিনি সুহৃদ অর্থাৎ সকলের হিতকারী।

৭। তিনি আত্মদ, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলে তিনিও নিজেকে দান করেন।

৮। জীব ও শ্রীভগবান্

যেমন তুমি এক, কিন্তু স্বপ্নে বহু রচনা কর, তেমনই শ্রীভগবান্ এক হইয়াও বহু রচনা করিয়াছেন। কেবলা-দ্বৈতবাদী বলেন, জীবই আপন দেহ রচনা করে। বৈষ্ণব

দার্শনিক বলেন, ঈশ্বর জীবের সংকল্পানুসারে দেহ রচনা করিয়া থাকেন। জীব অনুতত্ত্ব। জীব স্বয়ং-জ্ঞাতা বা কর্ত্তা নহেন। অকর্তৃত্বই জীবের স্বরূপ। জীব ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন। জীবের একটি প্রবলা বৃত্তি আছে, সেটি ইচ্ছা বা সংকল্প। সংকল্প করা ব্যতীত জীবের আর কোন শক্তি বা স্বাতন্ত্র্য নাই।

৬। শ্রীহরিনামমাহাত্ম্য ও নামের প্রধান বিঘ্ন,—সন্তের নিন্দা

সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় প্রত্যেক মনুষ্যের শ্রীহরি-নাম করা কর্ত্তব্য। আমাদের মত দুর্ব্বল জীবের সবলের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। শ্রীহরি-নামের মত সবল কিছুই নাই। নামী যাহা করিতে পারেন না, নাম তাহা করিতে সমর্থ।

শৈব, শাক্ত গাণপত্য ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ী মানবের হরিনাম করিতে হইবে। "কলিকালে নাম বিনা গতি নাই" তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা!"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগত নিস্তার॥

দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
কেবলশব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান, যোগ, তপ, কর্ম্ম আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিনবার এবকার॥"

পুনরায় বলিয়াছেন,—

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥"

চৈঃ চঃ মৃঃ।

একবার কৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারণ করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। যে নামের এত মাহাত্ম্য, আমরা সেই নাম করিতেছি, অথচ নামের মুখ্যফল যে কৃষ্ণ-প্রেম, তাহা পাইতেছি না। তাহার নিশ্চয় কোন কারণ আছে। যে অন্তরায় আমাদের নামের মুখ্য-ফল হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহা সম্যক্‌রূপে জানিতে হইবে। কারণ, তাহা জানিতে না পারিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা অসম্ভব। এই অন্তরায় দুই প্রকারের। একটি পাপ, অপরটি অপরাধ। বিধি ও নিষেধকে লঙ্ঘন করাকে পাপ কহে, অর্থাৎ শাস্ত্র যাহা করিতে বলিতেছেন, তাহা অকরণ এবং শাস্ত্র যাহা করিতে বারণ করিতেছেন,

তাহা করণ,—পাপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এবং শ্রীভগবান্ বা শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুর অমর্য্যাদাকরণকে অপরাধ কহে। প্রথমটি এই প্রাকৃত জগতের সাধারণ আইন লঙ্ঘন করা ও অপরটি রাজা বা রাজপুরুষের অমর্য্যাদা করার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহার মধ্যে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অপরাধের স্বরূপ গুণময়, ভক্তির স্বরূপ চিন্ময়, অতএব গুণময় বস্তু কি প্রকারে চিন্ময় বস্তুর বাধক হইতে পারে? বস্তুতঃ, বিচারে গুণময় বস্তু চিন্ময় বস্তুর বাধক হইতে পারে না। কিন্তু চিন্ময় বস্তু যদি ইচ্ছা করেন যে, গুণময় বস্তু,—অপরাধ, যাহার থাকিবে, তাহার পক্ষে চিন্ময়-বস্তু, ভক্তিলভ্য হইবে না; তাহা হইলে গুণময় বস্তুর পক্ষে চিন্ময় বস্তুর বাধক হওয়া অসম্ভব নহে। মায়া যেমন, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় শ্রীভগবানের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের জীবকে তাঁহার দিকে উন্মুখ না করিয়া বহির্ম্মুখ করিয়া রাখে, অপরাধ তেমনই শ্রীভক্তি দেবীর ইচ্ছায় ভক্তির বাধক হইয়া থাকে।

অপরাধ দুই ভাগে বিভক্ত;—নামাপরাধ ও সেবাপরাধ। নামাপরাধ গুরু ও সেবাপরাধ লঘু। নামাপরাধ দশটি। তন্মধ্যে সতাং নিন্দা, অর্থাৎ (মহতের) নিন্দা সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ।

মহতের নিন্দা করিলে নামাপরাধ হইবে, এই কথা শুনিয়া কেহ বলিতে পারেন—"আমি ত নামের নিন্দা করি

নাই, সতের নিন্দা করিয়াছি, সুতরাং আমার নামাপরাধ হইবে কেন ?"

তাহার উত্তর এই যে, সতের নিন্দাই নামের নিন্দা। মহৎব্যক্তিই নামের প্রচারক ও পুষ্টিকারক বা নামের ভিত্তিস্বরূপ। সাধু ব্যক্তি শ্রীনামের প্রচার ও গুণকীর্ত্তন না করিলে, আজ তাঁহার এত উচ্চ আসনে উপবেশন অসম্ভব হইত; তাঁহার যে এত মাহাত্ম্য, তাহা লোকের অজ্ঞাত থাকিত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নামের এই মর্য্যাদা, এত প্রতিষ্ঠা, এত যশঃ পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল না। তিনি এবং তাঁহার পার্ষদগণ যদি যাচিয়া মার খাইয়া, জীবের হাতে ধরিয়া নামের প্রচার না করিতেন, নাম আর নামী যে অভেদ, তাহা সরল ভাষায় পণ্ডিত ও মূর্খকে না বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে চিনিত কে? নাম কৃতজ্ঞ, সেই জন্য যে সতের দ্বারা আজ তাঁহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান, যাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি শত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া জগতের সমক্ষে বিদ্যমান, নাম সেই সতের নিন্দা আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। তথাহি শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে,—

"সতাং নিন্দা পরমাপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুপসহেতেত্যবির্গহাম্।"

অর্থাৎ সতের নিন্দা করিলে নামের নিকট পরম অপরাধ হয়। কারণ, যে সতের দ্বারা নামের যশঃ জগতে

ঘোষিত হয়, তাঁহার নিন্দা তিনি কি প্রকারে সহ্য করিবেন? নিন্দা করিতে মানুষ খুব পটু। নিন্দা করিবার প্রয়োজন হইলে লোকে অনুমান-প্রমাণ যাহা পায়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু কাহারও গুণের ব্যখ্যার যদি প্রয়োজন হয়, আমরা তাহা হইতে নিরস্ত হই; অধিকন্তু কাহার গুণ প্রত্যক্ষ করিলেও তাহার অপবাদ দিয়া থাকি। আমরা কাহারও যথার্থ পবিত্র ভাব দেখা সত্ত্বেও তাহাকে দুষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সাধু ব্যক্তি, তাঁহারা কাহার দুষ্টভাব দেখিলেও তাহা পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। নিন্দা যে হৃদয়ে কত আঘাত করে, তাহা আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করিতে পারি। যদি শুনা যায়, কেহ আমার নিন্দা করিতেছে, তাহা হইলে প্রাণে যত আঘাত লাগে, মর্ম্মগবাণের দ্বারা বিদ্ধ হইলেও বোধ হয় তত আঘাত লাগে না। সাধু অসাধু কাহারও প্রাণে ব্যথা দেওয়াই অন্যায়। মহাভারতে লিখিত আছে,—

"পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্‌বেজয়তি যো জনঃ।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি॥"

অর্থাৎ "কৃপালু পিতা যেমন পুত্রকে কোন প্রকার উদ্বেগ দান করেন না, সেই প্রকার যে ব্যক্তি কোন মনুষ্যকেই উদ্বেগ দান করেন না, সেই বিশুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি শ্রীহৃষীকেশ

সত্বর প্রসন্ন হয়েন।" অতএব—"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে", শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই আদেশ-বাক্য মনে রাখিয়া পরনিন্দা হইতে সতত বিরত থাকিতে হইবে। কারণ,—

"নিন্দায় নাহিক লাভ সবেমাত্র পাপ।
অতএব নিন্দা ছাড়ে মহা মহাভাগ॥"

যথার্থ যে পাপী তাহারও যদি আমরা নিন্দা করি, তাহা হইলেও আমাদের পাপ হয়; যথার্থ সাধুর নিন্দা করিলে যে অপরাধ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 'পাপিনাং পাপকীর্ত্তনং পাপং' অর্থাৎ পাপীর পাপ কীর্ত্তন করা পাপ। পাপী পাপ করিয়া যে দুঃখ পায়, তাহার নিন্দাকারীকে সেই দুঃখের অংশ ভোগ করিতে হয়।

'সতের নিন্দা', এই সৎ বলিতে কাহাকে বুঝিতে হইবে? কোন ব্যক্তি যদি তাহার দুরাচারত্ব সত্ত্বেও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করে, তাহা হইলে তাহাকে 'সৎ' এই আখ্যা দেওয়া হইবে। কারণ, অসৎ বা দুষ্ট অবস্থাতেই মানুষ শ্রীভগবান্‌কে ভজে এবং ভজিতে ভজিতে পরে সাধু হয়। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।"

অর্থাৎ অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য দেবদেবী

ভজন না করিয়া কেবল আমাকে ভজন করেন, তাঁহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে। এইটি আমার আদেশ-রূপ বিধি। অবশ্য শাস্ত্র আমাদের এমন লোকের সঙ্গ করিতে আদেশ করিতেছেন না, কিন্তু তাই বলিয়া উঁহাদের নিন্দা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।

আমরা বলিয়া থাকি. 'অমুক ব্যক্তি সাধু হইয়া মিথ্যা কথা বলেন।' বস্তুতঃ সাধু হইয়া কেহ মিথ্যা কথা বলেন না। মিথ্যা বলা, দেহ ও মনের অনাদিকালের স্বভাব। যে সত্যবাদী, সে নির্দোষ, আমরা এই কথা বলিব। কিন্তু সত্যবাদী কে? মায়ার কোন কথা কয় না যে, সত্যবাদী সে। যত দিন অবিদ্যার অধিকারে আছি, তত দিন স্থূলবিচারে আমাদের মধ্যে সত্য মিথ্যা আছে। সূক্ষ্ম বিচারে পারমার্থিক জগতে একটিমাত্র দোষ, শ্রীভগবৎ-বিস্মৃতি ও একটিমাত্র গুণ শ্রীভগবৎস্মৃতি। সুতরাং এখন মায়ার ভিতরে থাকিয়া যদি কাহারও হৃদয়ে শ্রীভগবানের কথা জাগরূক হয়, তাহা হইলে তাঁহার শত দোষ থাকা সত্ত্বেও নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

নিন্দা বলিতে কেবলমাত্র যে দোষকীর্ত্তন বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। আমি কোন ব্যক্তির নিন্দা করিলাম না, কিন্তু তাহাকে প্রহার করিলাম, তাহা হইলে কি আমার অপরাধ হইবে না? তাই বলিতেছেন—

"হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

বৈষ্ণবকে হত্যা করা, তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করা, তাঁহাকে দ্বেষ বা তাঁহার ক্ষতি করা, তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া, তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষের উদ্গম না হওয়া, এই ছয়টি পতনের কারণ।

আবার বলিতেছেন :—শ্রীভাগবতে ১০।৪।৪৬

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

মহাত্মগণের প্রতি অত্যাচার বা অপরাধ করিলে পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক ও উন্নতি এবং সকল প্রকার কল্যাণই নষ্ট হইয়া থাকে। এখানে বৈষ্ণব বলিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম এই তিন শ্রেণীকে বুঝাইবে। যার মুখে একবারও কৃষ্ণ নাম শুনা যায়, তিনি বৈষ্ণব।

"প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম যাহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব পূজ তাহার চরণে॥"

অর্থাৎ যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।

যাঁহার মুখে অনবরত কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হয়, তিনি মধ্যম শ্রেণীর বৈষ্ণব, এবং

"যাঁহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম,
তাঁহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।"

অর্থাৎ তিনি উত্তম শ্রেণীর বৈষ্ণব। এই তিন শ্রেণীর যে কোন বৈষ্ণবকে নিন্দা করিলে অপরাধ হইবে। কেন না, কোনও বৈষ্ণব প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেও তাঁহার চিত্তবৃত্তি শ্রীভগবানের দিকে গিয়াছে; পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেহ সাধু হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ভজে না, সুতরাং যখন তাঁহার মন একবার শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন তিনি ভক্ত আখ্যা পাইয়াছেন।

তাই শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তি আমাকে ভজন করিলে সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবে ও শান্তি প্রাপ্ত হইবে। হে অর্জ্জুন, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হইবে না। মহতের নিন্দা করিলে যেমন অপরাধ হয়, মহতের নিন্দা শ্রবণ করিলেও সেইরূপ অপরাধ হইয়া থাকে। যদি কোন সন্ন্যাসীকে কোন ব্যক্তির নিন্দা করিতে শুনা যায়, তাহা হইলে সন্ন্যাসী নিন্দা করিতেছেন বলিয়া তাহা শুনিতে হইবে না। কেন না,—

"সন্ন্যাসীর সভায় যদি হয় নিন্দ্যকর্ম্ম।
মণ্ডপের সভা হ'তে সে সভা অধর্ম্ম ॥"

হয় ত কাহাকেও এমন অবস্থায় পড়িতে হয় যে, কোন স্থানে সাধুর নিন্দা হইতেছে অথচ তাঁহার এমন সামর্থ্য নাই যে, তিনি তাহার প্রতিবাদ বা প্রতীকার করিতে পারেন। সবলের কাছে দুর্ব্বলের চিরকালই পরাজয়। তিনি কিছু বলিতে পারিতেছেন না অথচ উঠিয়া যাইতেও পারিতেছেন না। তখন তাঁহাকে কি করিতে হইবে? পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐরূপ কুসংসর্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। শ্রীগোবিন্দের চরণে তাঁহার আন্তরিক কাতরতা জানাইতে হইবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি নিন্দাকারী অপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার কি কর্ত্তব্য? শাস্ত্র বলিতেছেন, উক্ত নিন্দাকারীর জিহ্বা কাটিয়া ফেলিলে তিনি সাধুনিন্দা-শ্রবণজনিত অপরাধের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে সাধুর নিন্দা শুনিয়া দুঃখে ক্ষোভে দেহ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। যে দেহের অঙ্গ কর্ণ, তাহা দ্বারা যখন সাধুনিন্দা শ্রবণ করা হইয়াছে, তখন আর সে দেহ ধারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, এই বিবেচনায় তাঁহারা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দক্ষযজ্ঞে ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। দক্ষ যখন সতীকে শুনাইয়া

শ্রীশিবের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সতী দেখিলেন, দেহত্যাগ ভিন্ন ইহার প্রতীকারের আর কোন উপায় নাই। কারণ, দক্ষ পিতা, গুরুজন, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণও নিন্দনীয়; তাই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

সতের নিন্দাজনিত নামাপরাধের কথা বলা হইল; এখন ঐ অপরাধের কবল হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

প্রায়শ্চিত্ত করিলে সেবাপরাধের খণ্ডন হয়, এইরূপ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; কিন্তু নামাপরাধ খণ্ডনের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই। নামাপরাধ হইতে উদ্ধার হইবার একটিমাত্র পন্থা আছে, সেইটি এই—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

অর্থাৎ নামকীর্ত্তন দ্বারা নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অনবরত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলে প্রেমোদয় হয়।

আমরা অনেক সময়ে অপরাধ করি, কিন্তু সকল সময় জানিতে পারি না, কোথায় এবং কাহার নিকট অপরাধ ঘটিয়াছে অথচ ফলে বুঝিতে পারি যে, আমার অপরাধ হইয়াছে। কারণ, যে নাম সকল পাপ হরণ করেন, সেই নাম লওয়া সত্ত্বেও আমাদের পাপ নষ্ট হইতেছে না। পাপ যদি নষ্ট হইত, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে পাপবাসনার

উদয় হইত না। পাপ করিবার প্রবৃত্তির যখন নিবৃত্তি হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, নামের দ্বারা পাপের বিনাশ হইয়াছে। কেবলমাত্র অসৎকার্য্য সম্পাদন করা পাপ নয়, ঐ অসৎকার্য্য করিবার বাসনাও পাপ। অসতী বৃত্তি সূক্ষ্মরূপে অন্তরে থাকে; সাধু হইতে হইলে ঐ বৃত্তির মূলচ্ছেদনে যত্নবান্ হইতে হইবে। কোনও অসতী বৃত্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে আমরা বিচার করিয়া তাহার কার্য্যকে স্থগিত করিয়া রাখিতে পারি; কিন্তু তাহাকে সমূলে বিনাশ করিতে পারি না। এই পাপ এবং তাহার বৃত্তি অপরাধকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। একবার উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামের পাপবিনাশের যত শক্তি আছে, পাপীর তত পাপ করিবার ক্ষমতা নাই;—

"একবার কৃষ্ণনাম যত পাপ হরে।
পাপীদের সাধ্য নাই তত পাপ করে॥"

কিন্তু নাম করা সত্ত্বেও আমাদের একটিও পাপ নষ্ট হইতেছে না। তাহার কারণ—অপরাধ সেনাপতি হইয়া পাপরূপ সেনাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শনের চেষ্টা করে, তখন যদি সেখানে সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি কি করেন? তিনি যেমন জয়ের আশা দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করাইয়া পুনরায় যুদ্ধে

নিয়োজিত করেন, তেমনই নামের প্রকোপে পাপ যখন পলাই-বার উপক্রম করে, অপরাধ তখন তাহাদিগকে উৎসাহদানে নিজ অধীনে রাখিয়া স্ব স্ব কার্য্যে পরিচালিত করেন।

যাহা হউক, তাহা হইলে যেখানে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের অপরাধ ঘটিয়াছে, সেখানে কি করা কর্ত্তব্য? কোন ব্যক্তির নিকট যদি আমরা কোন দোষ করি, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে যেমন আমরা ক্ষমা পাই না, তেমনি যাহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, তাহার সন্তোষ-বিধান করিতে না পারিলে অপরাধের খণ্ডন হইবে না। সুতরাং যাহার কাছে আমরা অপরাধী, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করিতে হইবে ও তিনি কোথায় থাকেন, তাঁহার খবর লইতে হইবে, তবেই ক্ষমা চাওয়া সম্ভবপর হইবে।

কোন আফিসের জনৈক কর্ম্মচারী কোন কারণে তাঁহার আফিসের বড় বাবুর অতীব অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বড় বাবু কথায় কথায় তাঁহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দিবার ভয় দেখাইতেন। মন্দভাগ্য কর্ম্মচারী যখন এইরূপ সঙ্কটে পতিত, তখন তাঁহার এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন যে, বড় বাবু তাঁহার স্ত্রীকে বিশেষ প্রীতি করেন, কোন রকমে তাঁহাকে ধরিতে পারিলে বড় বাবুর ক্রোধের প্রকোপ হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। ঐ ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুর পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন। সেইরূপ যখন কোন্ সাধুর নিকট অপরাধ হইল, তাহা

জানিতে পারা যায় না, তখন কি করিতে হইবে? সতের প্রিয়বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিতে পারিলে অপরাধের খণ্ডন হইবে। সকল সতের প্রিয়বস্তু—ভক্তিসাধন। সকল প্রকার ভক্তিসাধনের মধ্যে মুখ্য সাধন শ্রীহরিনাম। সুতরাং আমি যদি নামের তোষামোদ করিয়া তাঁহার তুষ্টিবিধান করিতে পারি, তাহা হইলে সাধুর স্থানে আমার যত অপরাধ ঘটিয়াছে, সবই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যে সাধুর নিকট অপরাধ ঘটিয়াছে, তাঁহার কাছে নাম আছেন, অপরাধীর কাছেও নাম আছেন। নাম স্বতঃই সাধুর হৃদয়ে এই ভাবটি জাগাইয়া দিবেন যে, "আমি অজ্ঞ, না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধু আমায় ক্ষমা করিবেন।

সুতরাং অপরাধ থাকুক বা না থাকুক, অনন্যোপায় হইয়া নামকে আশ্রয় করিতে হইবে। সকল সাধন আমাদের যোগ্যতার অপেক্ষা করেন। কিন্তু নাম কোন যোগ্যতার অপেক্ষা করেন না। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় করি, এই-টুকুই তাঁহার অপেক্ষা। শ্রীহরিনাম স্মরণে দেশ কাল পাত্র অপেক্ষা করে না।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্যম্ :—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ॥

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিত-গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

“অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥

নাম করিতে হইলে দীক্ষার পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই, তাই বলিতেছেন—

“নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে।
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥”
অর্থাৎ “দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥”

শ্রীচৈঃ চঃ ।।

রসনাস্পর্শমাত্র নাম জীবকে পবিত্র করেন, ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম। আমাদের কোনরূপ শুদ্ধি নাই, আমরা অতীব অপবিত্র। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ দেখিতে পাই, নাম করিতে হইলে কোন প্রকার শুদ্ধির প্রয়োজন

হয় না। একান্তভাবে নামকে আশ্রয় করিলে নিশ্চয়ই জ্ঞাত, অজ্ঞাত, এ জন্মের ও জন্মান্তরের সকল অপরাধের ক্ষয় হইবে। নাম নিজেই গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন— তুমি যদি পাপী হও, তোমাকে তরাইতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু সতের নিন্দারূপ অপরাধে যদি তুমি জড়িত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে উদ্ধার করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। নিন্দাশূন্য হইয়া একবার নাম করিতে পারিলে নাম আমাদিগকে অবলীলাক্রমে ভবনদীর ওপারে লইয়া যাইবেন।

"এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥"

যতই পাপ থাকুক না কেন, যদি সাধুর নিকট অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে নামের শক্তির কথা দূরে থাকুক, নামাভাসেই জীব তরিয়া যায়, কারণ—

"ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে"

অর্থাৎ ভক্তির আভাসে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হয়েন।

তাহার জলন্ত প্রমাণ অজামিল। অসংখ্য পাপে মলিন থাকিলেও তাঁহার সাধু-নিন্দা-জনিত অপরাধ ছিল না বলিয়া নামাভাসে তিনি মুক্তি পাইলেন।

যাঁহার নিকট অপরাধ, তাঁহাকে জানিতে না পারিলে, নাম করিলে অপরাধের ক্ষালন হইবে; কিন্তু যাঁহার নিকট

অপরাধ, তাঁহাকে জানি, এবং জানা সত্ত্বেও তাঁহার নিকট গমন না করিয়া বা ক্ষমা না চাহিয়া যদি অপরাধ-মোচনের জন্য নাম করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা অপরাধ-মুক্ত হইতে পারিব কি না? শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, কোন ব্রাহ্মণ কোনও নীচজাতীয় সাধুর নিকট অপরাধ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ তাহা অবগত আছেন, তথাপি নিজের জাত্যভিমান বশতঃ নীচজাতীয় ব্যক্তির নিকটে গমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, নামাপরাধ নিবারণের যখন প্রকৃষ্ট উপায় নামকীর্ত্তন, তখন তাহাতেই প্রবৃত্ত হই। নীচজাতীয় সাধুর নিকট যাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এইরূপ অবস্থা হইলে শাস্ত্র বলেন, তোমার নামকীর্ত্তনে অপরাধ-মোচন ত হইবেই না, বরং তোমার অপরাধের বৃদ্ধি হইবে। সাধুকে নীচজাতীয় বলিয়া অবজ্ঞা করার জন্য আবার একটি নূতন অপরাধ পূর্ব্বাপরাধের সহিত যোগদান করিবে। নীচজাতি হইলেও তাঁহার চরণ ধরিয়া কাতরভাবে ক্ষমা চাহিতে হইবে। এ স্থানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের দ্বিতীয় স্বরূপ হইয়া কি প্রকারে নীচজাতীয় ব্যক্তির চরণ স্পর্শ করিবেন? শ্রীভগবান্ তাহার উত্তরে বলেন যে, আমি স্বয়ং যে ভক্তের চরণ স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হই না, আমার দ্বিতীয় স্বরূপ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

ভক্তের মন একান্তভাবে শ্রীভগবানে অর্পিত। শ্রীভগবানের অসংখ্য ভক্ত আছেন। সেই জন্য তাঁহার মন অসংখ্য-ভাগে বিভক্ত। শ্রীভগবানের মনে কুণ্ঠার উদয় হয় যে, তিনি ভক্তের ভক্তি অনুযায়ী তাহাকে ভজিতে পারেন না। তাঁহার ভয় হয়, তিনি নিজের এই প্রতিজ্ঞা "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" অর্থাৎ যিনি আমাকে যেরূপ ভজন করেন,আমিও তাঁহাকে সেইরূপ ভজন করি,ইহা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। সেই কারণে তিনি নিজেকে ভক্তের নিকট ঋণী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সেই ঋণদায় হইতে মুক্তি পাইবার আশায় তিনিও ভক্তের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপরাধীর কর্ত্তব্য পায়ে পড়া এবং যাঁহার নিকট অপরাধ হয়, তাঁহার কর্ত্তব্য, চরণ স্পর্শ করিতে না দেওয়া; তাহা হইলে এই প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা হয় এবং উভয় পক্ষের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহা হইলে দেখা গেল, অপরাধ করিলে ক্ষমা চাহিতে হইবে, তাহাতে জাতির কোন বিচার চলিবে না। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ বলিতেছেন, শ্রীদুর্ব্বাসা ও শ্রীঅম্বরীষমহারাজের উপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ দৃষ্ট হয়। শ্রীদুর্ব্বাসামুনি যখন মহারাজ অম্বরীষের নিকট অপরাধ হেতু সুদর্শনচক্রের তাড়নায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া শ্রীভগবানের নিকট আগমন করতঃ কাতরভাবে তাঁহার অস্ত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেনঃ—"ওহে দুর্ব্বাসামুনি, আমি ভক্তাধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য। ভক্তজন আমার প্রিয়। সাধুভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছেন। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে আমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না। সাধুভক্তগণই আমার হৃদয়; এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ভিন্ন আর কিছুই জানি না।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হে মুনিবর! সেই অম্বরীষ আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছে, সে আমা বই আর কাহাকেও জানে না; আমিও ভক্ত বই আর কাহাকেও জানি না। তাহার নিকট গমন কর, সে যদি তোমায় ক্ষমা করে, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে; অতএব 'যাহি মা চিরং'। অর্থাৎ শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর। শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাসা মুনি শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের সন্নিধানে গমন করত অতীব কাতর হইয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পাদস্পর্শ করাতে রাজর্ষি সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। তিনি সুদর্শনের বহুবিধ স্তব করিয়া তাহাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেনঃ—

"যন্ত্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্ম্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ।
কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ॥
যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ॥"

অর্থাৎ হে সুদর্শন! যদি আমার কোন দান অথবা যজ্ঞজন্য সুকৃতি থাকে, যদি আমি উত্তমরূপে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, বিপ্রই যদি আমাদের কুলদেবতা হন, প্রার্থনা করি, তৎপ্রভাবে এই দ্বিজ শীঘ্র বিজ্বর হউন। যদি অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বভূতের প্রতি আত্মভাব হেতু সর্ব্বগুণাশ্রয় শ্রীভগবান্ আমাদের প্রতি প্রীত থাকেন, তবে তাঁহার প্রসাদে এই দ্বিজ বিজ্বর হউন।

মহারাজের এই কাতরোক্তি শুনিয়া সুদর্শন তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ নিজে মুনিকে ক্ষমা করিলেন না; শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের নিকট পাঠাইলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সতের নিকট অপরাধ করিয়া শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তিনি ক্ষমা করেন না, উক্ত সতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। যাঁহার নিকট অপরাধ হয়, তিনি যদি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত সেই অপরাধের নিবর্ত্তক হইতে পারেন না, তাই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বলিতেছেন—

"বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণপ্রেম হইলেও তার প্রেম হয় বাধ॥"

শ্রীঅদ্বৈত ঠাকুরের নিকট শ্রীশচীমাতার অপরাধ ছিল বলিয়া শ্রীনিবাসের অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মাতাকে প্রেমভক্তি দিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন ঃ—

"প্রভু বোলে উপদেশ কহিতে যে পারি।
বৈষ্ণব-অপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥
যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে, সে ঘুচে নারে আর॥"

ভক্তির সামর্থ্য।

ভক্তিযোগ স্বভাবতঃ অপ্রতিহত অর্থাৎ ভক্তিদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন বিঘ্ন দূর করিবার জন্য উপায়ান্তরের প্রয়োজন হয় না। ভক্তিদেবী বলেন, "বৎস! ভাল করিয়া আমাকে ধরিয়া থাক, কেহ কিছু করিতে পারিবে না। কোন প্রকার বিঘ্ন দেখিয়া আমাকে ছাড়িও না। দেখিও যেন, ভজনে শৈথিল্য না আইসে। আমাকে ধরিয়া থাকিলে সকল বিঘ্ন দূর হইবে।"

এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ১১শ স্কন্ধে শ্রীভাগবত ধর্ম্মের একটি শ্লোক এই ঃ—

"যানাস্থায় নরো রাজন্! ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

অর্থাৎ ভক্তিপথ বিস্তীর্ণ রাজপথের সদৃশ। ভক্তিপথ অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য কখনই প্রমাদ-গ্রস্ত হন না। এই পথে নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না।

ভক্তিলাভের জন্য বিঘ্নের প্রার্থনা।

কোন কোন ভক্ত ভক্তিলাভের জন্য বিঘ্নের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। মানুষ সম্পদে থাকিলে শ্রীভগবানের কথা মনে করে না। বিপদে পড়িলেই শ্রীভগবানের স্মরণ হয়। ার্ত্ত, অর্থার্থী প্রভৃতির ভগবৎস্মৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রীমতী ীদেবী নিরন্তর বিপদ্‌বরণ করিয়াছিলেন। কারণ, পদেই শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মৃতিতে জাগিবে। শ্রীভাগবতে শ্রীমতী কুন্তীদেবীর উক্তি এই :—

> "বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো!
> ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥"

হে জগদ্‌গুরো! আমার যেন সেই সকল বিপদ্ সর্ব্ব-দাই উপস্থিত হয়, যে বিপদের সময়ে আপনার দর্শন-লাভ হয়। কারণ, যে ব্যক্তির আপনার দর্শন ঘটে, তাঁহার পুনর্ব্বার ভবদর্শন অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না।

এ সংসারে বিপদ্ অনিবার্য্য। বিপদ্ উপস্থিত হইলে তীব্র ভজন করিতে হয়। তাহা হইলে বিপদ্ আমাদের

অজ্ঞাতসারে দূর হইয়া যাইবে। তীব্র বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও অবিচলিত থাকিতে হইবে। অবিচলিত থাকাই ভক্তের লক্ষণ।

দান ও বিষয়ভোগ।

দান কি? শ্রীভগবান্‌কে নিজের ভোগ্যবস্তুর অর্পণই দান। ইহার ফল ইন্দ্রাদিরও দুর্লভ। ইন্দ্রাদি বৈভব পাইয়াছেন বটে, কিন্তু শান্তি পান নাই। ভক্ত বৈভবও পাইবেন, শান্তিও পাইবেন। শ্রীভগবানের নিকট কিছু চাহিতে নাই। কেবল ভজন করিতে হইবে। শ্রীহরি সব ব্যবস্থা করিবেন তজ্জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। চাহিবার পূর্ব্বে ভক্তিদেবী সব সমাধান করিবেন। আমরা সাপ ধরিতে গেলে সাপ আমাদিগকে দংশন করিবে। সাপুড়ের সাহায্যে ধরিলে দংশনের ভয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকৃপায় যে সকল বিষয় আমাদের ভোগার্থে উপস্থিত হয়, তাহাতে যাতনার ভয় থাকে না। কারণ, সর্ব্বজীবের প্রতি শ্রীভগবানের সাধারণী কৃপা। কিন্তু ভক্তের প্রতি তাঁহার বিশিষ্টা কৃপা।

অন্য দেবতাভজন।

কারণ, অন্য দেবতাগণ শ্রীহরির অংশ বা অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং শ্রীহরিকে ভজনা করিলে সকলের ভজনা হইয়া থাকে স্বতন্ত্ররূপে অন্য দেবতাভজনের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই অপরাধ হইবে। যদি বল, কামনাপূরণের জন্য অন্য দেবতার অর্চ্চনা প্রয়োজন। কারণ, পৃথক্ পৃথক্ দেবতা-ভজনে পৃথক্ পৃথক্ কামনা-পূরণ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার প্রয়োজন নাই, কারণ, একমাত্র শ্রীহরিভজনে সর্ব্বকামনাই পূর্ণ এবং সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। "চাই" কথাটি শিক্ষা করিতে হয় না। ইহা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক অর্থাৎ উহা জীবের নিত্যই আছে। কিন্তু একটি চাই আছে, যাহা শিখিতে হয়, সেটি ভক্তিকামনা।

শ্রীরুদ্রগীতা।

ভক্তিই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধন বিফল। কিন্তু ভক্তিসাধন করিলে অন্যান্য সাধনের সমগ্র ফললাভ হয়। ইহাই শ্রীভাগবতের অভিপ্রায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শুক-পরীক্ষিত-সংবাদ, শুক-শৌনক-সংবাদ, বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদ, পৃথু-সনৎকুমার-সংবাদ বর্ণন করিয়া শ্রীরুদ্রগীতার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীমহাদেবের উপদেশই রুদ্রগীতা নামে প্রসিদ্ধ। উহার মর্ম্ম এই :—

স্বধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির ধ্যান, কীর্ত্তন ও পূজা করা কর্ত্তব্য। ধ্যান মানসিক, কীর্ত্তন

বাচনিক এবং পূজা কায়িক সাধন। এইরূপে কায়মনো-বাক্যে সর্ব্বদা শ্রীহরিভজন করা বিধেয়। ভক্তির বহুবিধ অঙ্গ আছে। এক অঙ্গ সমাপ্ত হইতে না হইতেই অপর অঙ্গ আরম্ভ করিতে হইবে, যেন এক মুহূর্ত্তকালও ভজন ব্যতীত না যায়।

আয়ুর ব্যবহার।

শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥" ২।৩অঃ।১৭

অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইয়া ও অস্ত যাইয়া আমাদিগের আয়ু হরণ করিতেছেন। কেবল যাঁহার সময় শ্রীভগবৎকথাপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হয়,তাঁহার আয়ু তিনি হরণ করেন না। শ্রীহরি-কথাপ্রসঙ্গবিহীন সকল সময়ই আমাদের বৃথা অতিবাহিত হয়। জীবন ভরিয়া যে সকল কাজ করিলাম, তাহাতে কেবল ইন্দ্রিয়ের পোষণ হইল। আমরা আত্মবঞ্চক ও আত্ম-ঘাতী; কারণ, আমরা আত্মাকে কোনও আহার দিতেছি না। জ্ঞানে আত্মা পুষ্ট হন না—রসে পুষ্ট হয়েন। আমরা শ্রীহরিকে দেখি নাই, কিন্তু শ্রীহরিকথাপ্রসঙ্গে আমাদের চক্ষে জল আসে, হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি আমাদের পরম আত্মীয়।

পুনরায় বলিতেছেন :—

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥" ২।৩।১৮

অর্থাৎ তরুগণ কি বাঁচিয়া থাকে না, ভস্ত্রা কি ভিতরে বায়ু টানিয়া লয় না এবং বাহিরে বায়ু ছাড়ে না? গ্রাম্য পশুরা কি আহার করে না এবং স্ত্রীসঙ্গ করে না? যে সকল মানুষ শ্রীহরিভজনহীন, তাহারা বৃক্ষ, ভস্ত্রা ও পশুর সমান।

মনুষ্যের প্রতি গর্দ্দভ।

সংসারে আসক্ত মনুষ্যকে দেখিয়া গর্দ্দভ বলে, "হে মনুষ্যাকার গর্দ্দভ, আমার ভারবহনের নির্দ্ধারিত সময় আছে ও সীমা আছে; কিন্তু তোমার ভারবহনের নির্দ্ধারিত সময় বা সীমা নাই। কারণ, মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমাকে ভার বহন করিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে এক জন উপার্জ্জন করিবে আর পঞ্চাশ জন বসিয়া খাইবে। আত্মীয়স্বজন তোমাকে সুখের ভাগ দিবে না, কিন্তু দুঃখের ভাগ দিবে। হয় ত তুমি বিদেশে আছ; বাড়ীর সকলে যখন সুস্থ থাকে, তখন তুমি কোন চিঠিপত্র পাইবে না; কিন্তু কাহার অসুখ হইলে, অমনি টেলিগ্রাম পাইবে।

এইরূপ তোমাদের সারাজীবন দুঃখের ভার বহিতে হইবে। আমাদের ভার তোমাদের অপেক্ষা অনেক কম'।"

ভজনে ইন্দ্রিয়-নিয়োগ।

ঐ স্থানে আরও বলিয়াছেন ঃ—

"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন যোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ২।৩।২০
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥ ২।৩।২১
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥ ২।৩।২২
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥ ২।৩।২৩

অর্থাৎ যে মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ করে না, তাহার দুইটি কর্ণরন্ধ্র বৃথা ছিদ্র মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—কর্ণরূপ গর্ত্ত শ্রীভগবৎকথায় পূর্ণ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ কুকথারূপ সর্প আসিয়া উহাতে বাস করিবে। যে জিহ্বা শ্রীভগবৎকথা আস্বাদন না করে, তাহা ভেকজিহ্বাসম অর্থাৎ ভেককোলাহলরূপ পরচর্চ্চা শুনিতে পাইয়া মৃত্যুরূপ সর্প আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পরচর্চ্চাকারীকে গ্রাস করে। যে মস্তক মুকুন্দচরণে প্রণত না হয়, তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ ও কিরীটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র। যে হস্ত দ্বারা শ্রীভগবৎসেবা না হয়, সে হস্ত স্বর্ণকঙ্কণ-শোভিত হইলেও মৃতব্যক্তির হস্ততুল্য; যে চক্ষু শ্রীহরিবিগ্রহ দর্শন না করে, তাহা শিখিপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় অকর্ম্মণ্য; আর যে মনুষ্যের দুইটি পদ হরি-ক্ষেত্রে গমন না করে, সে দুইটি পদ বৃক্ষবৎ জন্মলাভ করিয়াছে মাত্র। যে জন শ্রীভগবদ্ভক্তের চরণরজ মস্তকে ধারণ না করে এবং শ্রীভগবচ্চরণন্যস্ত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ না করে, সে জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য।

ইন্দ্রিয়ের প্রভু শ্রীহরিকে সেবা না করিলে ইন্দ্রিয় কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রীহরিভজনেই সর্ব্বে-ন্দ্রিয় সন্তৃপ্ত হয়।

শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ

শ্রীপৃথুরাজের যজ্ঞস্থলে জ্ঞানশক্ত্যাবেশাবতার শ্রীসনৎ-কুমার আগমন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ দিয়া অবশেষে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

যদি শ্রীভগবানে ভক্তি কর, তবে সকল উপদেশই সফল হইবে। ভক্তিলেশমাত্র থাকিলেও জীবের কর্ম্ম-গ্রন্থি ছিন্ন হয়। যে অহন্তা ও মমতাবুদ্ধি জীবের বন্ধন ঘটায়, তাহা শ্রীভগবানে ন্যস্ত হইলেই মোক্ষসাধক হইয়া থাকে। যাঁহাদের মতি নির্ব্বিষয়া হইয়াছে (যেমন যোগীর ও জ্ঞানীর), তাঁহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়জয়ী হন নাই। দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণ যে কোন মুহূর্ত্তে বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের মহান্ অনর্থ ঘটাইতে পারে। কিন্তু ভক্তের ইন্দ্রিয়জয় অন্য প্রকার। তিনি ইন্দ্রিয়বৃত্তি বলপূর্ব্বক নিরোধ না করিয়া চিদানন্দ-রস—শ্রীভগবানের দিকে উহা পরিচালিত করেন। ইন্দ্রিয়গণ মলিন রসের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ রস পাইয়া প্রকৃতিস্থ ও স্থির হয়।

আমরা চিরকাল সাকার বস্তুর ভিতরে আছি, আমাদের পক্ষে নিরাকার ভাবনা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে। কারণ, দুর্ব্বল জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয় জয়

করা কঠিন ব্যাপার। যিনি ইন্দ্রিয়ের প্রভু, তাঁহার শরণ লওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়জয় সহজ হইবে। ভক্তিযোগ সহজ ও সুখময় সাধন।

জ্ঞানসাধন ও যোগসাধন ক্লেশজনক। কারণ, জ্ঞানী ও যোগী স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করেন। সর্ব্বজয়ী শ্রীভগবানের সাহায্য ব্যতীত সাধনায় পদে পদেই বিপদ্। তাই বলিতেছি, ভক্তিসাধন দ্বারা অর্থাৎ শ্রীহরিচরণ ভেলা করিয়া আমাদিগকে দুস্তর ভবসাগর পার হইতে হইবে।

জীবন্মুক্ত ভক্ত শ্রীহরির চরণে চলেন, শ্রীহরির চক্ষুতে দর্শন করেন, শ্রীহরির কর্ণে শ্রবণ করেন, শ্রীহরির রসনায় আস্বাদন করেন, শ্রীহরির হস্তে ধারণ করেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই শ্রীহরির সহিত তাদাত্ম্যলাভ করে।

শ্রীহরিভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

সকল শাস্ত্রেই হরিভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিমাহাত্ম্য স্পষ্টরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে শ্রীনারদ ঋষি বলিয়াছেন, "যে জন্মে শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই জন্ম; যে কর্ম্ম দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; যে আয়ুদ্বারা মানব শ্রীহরিভজন করে, সেই আয়ুই আয়ু; যে মন দ্বারা শ্রীহরির ধ্যান হয়, সেই মনই মন এবং যে বাক্য দ্বারা শ্রীহরির স্তুতি

হয়, সেই বাক্যই বাক্য।" এইরূপে অন্বয়মুখে শ্রীহরিভজন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার ব্যতিরেকমুখেও এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে, যথা—যদি হরিভক্তিলাভ না হয়, তাহা হইলে জন্মেই বা কি ফল, দেবতার আয়ুলাভ হইলেই বা কি সার্থকতা, বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা এবং তপস্যা দ্বারাই বা কি লাভ, বাগ্‌নৈপুণ্যেই বা কি ফল, চিত্তের সারল্যেরই বা কি সার্থকতা? নিপুণ বুদ্ধির, শরীরের শক্তির, ইন্দ্রিয়পটুতার দ্বারাই বা কি হইবে? যোগ, সাংখ্য, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই বা কি লাভ হইবে? শ্রীহরি যদি আত্মপ্রদ না হন, তবে এ সকলই বিফল। সকল সাধনার ফল আত্মসাক্ষাৎকার। শ্রীহরিই আত্মা। সুতরাং শ্রীহরির সাক্ষাৎকারই সকল সাধনের লক্ষ্য। ভক্তি ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার অসম্ভব।

সাধন, ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারবিশেষ। যদি কেবল সাধন-সাহায্যে পরতত্ত্বলাভ হইত, তাহা হইলে পরতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রকাশতার হানি হইত। কিন্তু কেবল সাধন দ্বারা পরতত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটে না। পরন্তু কৃপাই পরতত্ত্ব-প্রাপ্তির হেতু। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে ও পরমাত্মতত্ত্বে কৃপা নাই। কৃপা স্বীকারে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের ও পরমাত্মার নিয়ামকত্বের হানি হয়। নির্ধর্ম্মাত্মক ও নিঃশক্তিক ব্রহ্ম এবং উদাসীন ও নিয়ামক পরমাত্মা কৃপালু হইতে পারেন না। একমাত্র শ্রীভগবানই পরম দয়াল। তিনি

ভক্তের সুখে সুখী, ভক্তের দুঃখে দুঃখী। ইহাতে শ্রীভগবান্‌কে বিকারী বলা যায় না। কারণ, ভক্তি তাঁহারই স্বরূপশক্তি। শ্রীভগবানের হৃদয় জাগাইয়া দেওয়াই এই শক্তির স্বভাব। শ্রীহরি প্রাকৃত সুখ-দুঃখে নির্ব্বিকার হইলেও ভক্তের সুখ-দুঃখকে আপনার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করেন। ইহা ভক্তিরই অচিন্ত্য শক্তিবলে সম্ভবপর হয়। এ বিষয়ে শ্রীপাদসন্দর্ভকারের বিশেষ বিচার আছে। তাহাতে ইহাই জানা যায় যে, প্রাকৃত জগতের জীবগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীভগবানের কৃপা পান না। ভক্তগণই প্রাকৃত জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের প্রতি কৃপা করেন। শ্রীভগবানের কৃপা ভক্ত-কৃপাকে বাহন করিয়া জীবের দুঃখ দূর করেন, এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ চিদানন্দ-রসে নিয়ত নিমগ্ন। জীবের মায়িক সুখ ও দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি তাহা জানিতেও পারেন না। নিজে দুঃখের বেদনা না জানিলে দুঃখীর প্রতি কৃপাও হয় না।

“কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।”

কিন্তু পরম কারুণিক ভক্তগণ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে কৃপা করেন।

পরমাত্মসন্দর্ভে ও ভক্তিসন্দর্ভে ইহার সূক্ষ্ম বিচার

দ্রষ্টব্য। ফলতঃ জ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন, যোগীর পরমাত্মদর্শন ও ভক্তের শ্রীভগবদ্দর্শন শ্রীভগবৎকৃপা ভিন্ন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং তাঁহার কৃপাই জীবের মুখ্য সম্বল।

শ্রীহরিতোষণেই সকল দেবতার তুষ্টি।

বহু দেবের অর্চ্চনায় ঐকান্তিকতা নষ্ট হয়—অথচ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাতেই সকল দেবদেবী পরিতৃপ্ত হয়েন।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ঃ—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদির পরিপোষণ হয়, প্রাণে আহার দিলে যেমন সকল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তেমনি মূলস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাতেই সকল দেব-দেবী পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হন। তাঁহাদের পৃথক্ উপাসনায় যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ উপাসনায় তত্তাবৎই লব্ধ হইয়া থাকে।

মহৎসঙ্গ ও মহৎকৃপা।

শ্রীঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছেন ঃ— "হে পুত্রগণ! আমার সহিত যাহার সৌহার্দ্দ্য হয়,

তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণকে মহান্ বলা যায়। মহতের সেবা করিলে গৃহেই বৈকুণ্ঠলাভ হয়।" শ্রীভরত মহাশয় শ্রীরহূগণ রাজাকে শ্রীহরিভজন দ্বারা সংসারতরুচ্ছেদনের উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে শ্রীরহূগণের শ্রীহরিভক্তিলাভ হইয়াছিল।

সুদুর্ল্লভ মানব-জীবনে এমনভাবে চরিত্র গঠন করিতে হইবে যে, সেই চরিত্রাকর্ষণে মহান্ ভক্তগণের সমাগম হয়, এবং মহান্ ব্যক্তির কৃপা লাভ করিয়া এই জীবন কৃতার্থ হয়।

দুর্ল্লভ মানবজন্মে ভক্তিসাধন।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুর-বালকগণকে উপদেশ করিয়াছেন :—

"মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ এবং অস্থির হইলেও উহা অর্থপ্রদ। সুতরাং এই জন্মে কৌমারবয়সেই ভাগবত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।" কেন না, এই বয়সে কোন চিন্তা থাকে না। যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে চিত্ত নানা প্রকার বিষয়ে আসক্ত হয়। মনুষ্যদেহই ভজনযোগ্য দেহ। অন্য দেহে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু ভজনানন্দ লাভ হয় না। দেব-দেহে ঘোরতর বিষয়াবেশ হয়। পশ্বাদিদেহে বিবেকের অভাব। মনুষ্য-দেহে অন্যাবেশ আছে সত্য,

কিন্তু উহা স্থায়ী নয়। ভগবদ্ভজনপ্রভাবে উহা দূর হইয়া যায়। সুতরাং দুর্ল্লভ মানবজন্মের প্রারম্ভেই ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ এই যে, কৌমারবয়সেই ধর্ম্ম আচরণ সুসঙ্গত। কেন না, ইন্দ্রিয়-গণ একবার বিষয়াভিমুখী হইলে উহাদিগকে সংযত করা কঠিন ব্যাপার। এই জীবন চঞ্চল ও অধ্রুব। এই চঞ্চল জীবনে আবার কখন্ কি অবস্থা হয়, তাহারও স্থিরতা নাই। হয় ত অন্ধ, বধির বা উন্মত্ত হইতে পারি। জন্মান্তরে যে মানুষ হইয়া জন্মিব, তাহারই বা স্থিরতা কি? অতএব কালবিলম্ব না করিয়া হরিভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

বাসনা-নিবৃত্তির উপায়।

জীব বড় দুঃখ পাইতেছে। এই দুঃখের কারণ কি? বাহিরের কিছু ইহার কারণ নহে। স্বীয় বাসনাই ইহার কারণ। বাসনাই ছুটাছুটির হেতু। বাসনা-নিবৃত্তির সহস্র সহস্র উপায় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রীমান্ নারদ ঋষি যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অব্যর্থ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে উপায় শ্রীহরিচরণে রতি। শ্রীগুরু-চরণ-সেবা দ্বারা উক্ত রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় না করিয়া কেহ কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। ইহা উপযুক্ত নহে। শ্রীভগবানের সহিত

জীবের যে নিত্যসম্বন্ধ আছে,তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শ্রীগুরু দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। উহা ব্যতীত শ্রীভগবানে প্রীতির উদয় হয় না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুর-বালকগণকে বলিয়াছেন—জড়ীয় পদার্থে রতি সর্ব্ব অনর্থের মূল। শ্রীভগবানে রতি সর্ব্বমঙ্গলের হেতু। উক্ত রতির উদয় হইলে উহার পরিমাণ অনুসারে কর্ম্মবীজরূপ বাসনা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে বাসনা-নিবৃত্তি হয় না। অসৎসঙ্গে পার্থিব বাসনা বৃদ্ধি হয় এবং সৎসঙ্গে শ্রীহরিতে রতির উদয় হইয়া থাকে। দেহসঙ্গই অসৎসঙ্গ। দেহে যাহার রতি নাই, অন্য কুসঙ্গে তাহার ক্ষতি হয় না। এইরূপ মহতের সঙ্গে অসৎও সৎ হইয়া উঠে। কারণ, সুগন্ধি ফুল মাটীতে পড়িলে মাটীর গন্ধ কখনও ফুলে সংক্রামিত হয় না; প্রত্যুত ফুলের গন্ধ দ্বারাই মাটী সুবাসিত হয়।

সাধারণ ধর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম।

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির মহোদয়কে বলিয়াছিলেন যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যতীত এক সার্ব্বজনিক পরমধর্ম্ম আছে, তাহা হই-তেই শ্রীহরিভক্তির উদয় হয়। এই ধর্ম্মে সকলের সমান অধিকার। সাধারণ ধর্ম্ম শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত; উহা শ্রীভগ-বানের আজ্ঞা, তজ্জন্য সর্ব্বথা পাল্য। কিন্তু ভগবদাজ্ঞা হইলেও উহা মুখ্যা নহে, গৌণী। স্বতন্ত্ররূপে উহার

ফল-প্রদানের শক্তি নাই। যাঁহারা পরমধর্ম্ম প্রতিপালনের প্রয়াসী নহেন, তাঁহারা এই ধর্ম্ম লইয়া কালাতিপাত করেন। কিন্তু যাঁহারা সাধুভক্তের কৃপায় পরমধর্ম্মে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত সাধারণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীহরিচরণ ভজন করেন। সাধারণ ধর্ম্মপরিত্যাগ জন্য তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায় হয় না। সুতরাং সাধারণ ধর্ম্মের জন্য আগ্রহ না করিয়া সৎসঙ্গানুসন্ধান, শ্রীগুরুচরণাশ্রয় এবং তাঁহাদের কৃপাদেশে পরম ভাগবতধর্ম্ম বা আত্মপ্রসাদনী ভক্তিজনক ধর্ম্মাবলম্বন করতঃ একান্তভাবে শ্রীহরিচরণ ভজন করাই মানব-জীবনের একমাত্র মুখ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে অনেক বিধি-নিষেধ আছে, কিন্তু সকল বিধির রাজা :—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ

সর্ব্বদাই শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে।

এবং সকল নিষেধের রাজা

"বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ" অর্থাৎ

কখনই তাঁহাকে ভুলিও না।

জীবগণ কেবল এই বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলেই শ্রেষ্ঠতমা গতি লাভ করিতে পারিবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত